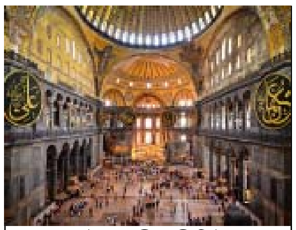

মৌলবাদী কীর্তি
তুরস্কের বিশ্ব বিখ্যাত
মিউজিয়াম এখন মসজিদ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

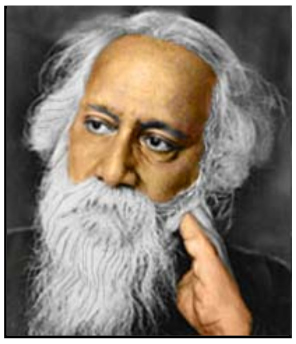

বিশেষ দ্বিতীয় ই-সংস্করণ, জুলাই '২০২০ ৪৮তম বর্ষ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

দুর্গত মানুষের পাশে প্রতিদিন

এই মুহূর্তে করোনা অতিমারীজনিত সঙ্কটের অভিঘাতে রাজ্যের খেটে খাওয়া, গরিব, সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। এই সঙ্কটের মধ্যেই মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিকে তছনছ ১করে দিয়ে গেছে সুপার সাইক্লোন আমফান। বিপর্যস্ত মানুষের পাশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে তহবিল সংগ্রহে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং এখনো করছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনারগণ। লকডাউনের শুরু থেকে প্রতিটি জেলায় যতটা সম্ভব দুর্গত মানুষের কাছে খাদ্য ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের নেতা-কর্মীরা। গত ৪, ৫ ও ৮ জুলাই সংগঠনের কলকাতার ৭টি অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ১৩টি মহল্লায় ১৩০০ পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, মাস্ক ও মশারি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে গোটা রাজ্যজুড়ে প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার পরিবারের কাছে এখনো অবধি সাহায্য পৌঁছানো গেছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা সংগঠনের উদ্যোগে কমিউনিটি কিচেনের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৩ হাজার মানুষের কাছে দুপুরের খাবার বিলি করা হয়েছে। মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়েই লকডাউনের সময় রাজ্যজুড়ে ভয়াবহ রক্ত সঙ্কটের সময় মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে জীবন বাজি রেখে প্রায় ৭০ জন নেতা-কর্মী বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করেছেন।

মানুষের পর্বত প্রমাণ দুর্দশার তুলনায় সামান্যই হয়তো সংগঠন করতে পেরেছে তার সীমিত ক্ষমতায়, কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার চিরাচরিত ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুযায়ী আক্রান্ত মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে এবং এই প্রয়াস জারি থাকবে। সংগঠন মনে করে অভূতপূর্ব এই সঙ্কটে আক্রান্ত মানুষের পাশে থাকাই প্রধান কর্তব্য। আরেকটি কর্তব্যণ সংগঠন যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছে। নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে বারংবার আবেদন জানানো হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সরকার বযবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। কর্মস্থলে আসার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থার দাবি করা হয়েছে। সর্বোপরি এই সময়কালে কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংগঠন সোচ্চার থেকেছে।

একটা বড় অংশের মানুষভয়াবহ দুর্দশার মধ্যে আছে। এই মানুষের পাশে থাকার কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। এরই অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গত ১২ জুলাই, শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যৌথ আন্দোলনের মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসে, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যাবতীয় প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে, এই কর্মসূচীকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বস্তরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের কলকাতার ৭টি অঞ্চল কমিটি এবং অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতি সমূহের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং সমাজকর্মী ডা. ফুয়াদ হালিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশীর্ষ ভট্টাচার্য। শতাধিক রক্তদানে ইচ্ছুক কর্মী-নেতৃত্ব উপস্থিত হলেও, আর জি কর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের কাছে মাত্র ৬০ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহের মতো কীট ছিল না। ফলে অনেকেই রক্ত দিতে না পেরে ফিরে গেছেন। ৬০ জন রক্তদাতার মধ্যে পাঁচ জন ছিলে মহিলা। কর্মী-নেতৃত্বের পুত্র কন্যারাও এই কর্মসূচীতে অংশ নেন। এই সময়কালেই সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা শাখা, প্রয়াত জননেতা কমরেড জ্যোতি বসুর জন্মদিবসে (৮ জুলাই) স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ঐ শিবিরে মোট ৪৯ জন রক্তদান করেন। □

সম্পাদকীয়

রাজনীতি না করার রাজনীতি

প্রায় গোড়া থেকেই এবছরটা অন্যরকম। আর পাঁচটা বছরের যে স্বাভাবিক ছন্দ, মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, আমোদ-প্রমোদ, শোষণ-উৎপীড়ন-বঞ্চনা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলন— এক কথায় যে যে উপাদানগুলির সমন্বয়ে বিশ্ব চরাচরে অতিবাহিত হয় প্রতিটি দিন ও রাত, তা ধাক্কা খেতে থাকে একেবারে বছরের শুরু সেই জানুয়ারি মাস থেকেই। কারণ ঐ মাসেরই দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) একটি অচেনা ভাইরাসের সংক্রমণকে 'প্যানডেমিক' বা অতিমারি হিসেবে ঘোষণা করে। ঐ মাসেরই একেবারে শেষ লগ্নে ঐ মারণ ভাইরাস এসে হানা দেয় আমাদের দেশে, দক্ষিণের রাজ্য কেরালাতে। কার্যত তারপর থেকেই সমস্ত ধরনের সংবাদ মাধ্যমের দৈনন্দিন প্রচার ও সম্প্রচারের একটা বড় অংশ দখল করতে শুরু করে করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯।

শুরুর দিকে এর বিপদকে লঘু করে দেখা, সংক্রমণ মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণে অনীহা, ব্যক্তি কেন্দ্রীক 'বাহুবলী' ইমেজের পোস্ট-ট্রুথ প্রচারের সাহায্যে সমাজের অভ্যন্তরে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন আশ্বাসের বলয় নির্মাণ প্রভৃতি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের প্রথমার্ধ জুড়ে এই ভাইরাসটিকে কার্যত বিনা বাধায় ডাল-পালা বিস্তারের সুযোগ করে দেয়। সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে যেমন পরিকল্পনাহীনতা ও অপরাপর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির খাঁচার বন্দী করে রাখা হলো একটা বড় সময় ধরে। তেমনই হঠাৎ করে 'দৃঢ়' পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্তও রাষ্ট্রীয় স্তরে গ্রহণ করা হলো কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। দেশজুড়ে মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে জারি করা হলো 'লকাডাউন'।

'লকডাউন'-এর বহুমাত্রিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় খেটে খাওয়া দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ও জীবিকার যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা-চর্চা চলছে নিরন্তর। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই আলোচনা ও বিতর্কে স্পষ্ট ভাগাভাগির দুটি শিবির দেখা যাচ্ছে। একটি শিবিরে রয়েছেন তাঁরা, যাঁরা জনসাধারণের স্বার্থের নিরিখে লকডাউন ও তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরছেন। অপর শিবিরে রয়েছেন সেই সমস্ত ভাগ্যান্বেষী বুদ্ধিজীবীর দল, যাঁরা সরকার বাহাদুরের চওড়া ছাতি থেকে উদ্ভূত হটকারি সিদ্ধান্তেই শিলমোহর লাগাতে ব্যস্ত।

এই শেষোক্ত শিবিরটিতে শুধুমাত্র ব্যক্তি বুদ্ধিজীবীরাই রয়েছেন তা নয়, 'নিও-লিবারাল' জমানায় সমাজের অভ্যন্তরে সর্বাধিক শক্তিশালী 'ওপিনিয়ন মেকার' মেইন স্ট্রীম মিডিয়াও এই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি বলা চলে তারাই চালিকা শক্তি। এরাই এখন কর্পোরেট পুঁজি ও শাসক রাজনৈতিক শক্তির যুগলবন্দীর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত প্রচারক। তাই আমরা যেটা লক্ষ্য করছি তা হলো, প্রথম পর্বের সিদ্ধান্তহীনতা, পরবর্তী হটকারি সিদ্ধান্ত (লকডাউন), তৎপরবর্তী সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার বিপন্নতা রোধে রোম সম্রাট 'নিরো' সুলভ উদাসীনতা, তারও পরে কিছু অন্তঃসার শূন্য লোক ঠকানো রিলিফ প্যাকেজের ঘোষণা এবং সবশেষে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট মালিকদের চরণে সেবা লাগি দেশের যাবতীয় সম্পদ জলের দরে তাদের হাতে তুলে দেওয়া—এই প্রতিটি পর্বে মিডিয়ার সোৎসাহ ঢাক পেটানো এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। আরও নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করলে দেখা ও শোনা যাবে, এই সম্মিলিত 'ঢ্যাং-কুড়-কুড়' ঢাকের বোল হলো একটাই—'এখন রাজনীতি কোরো না, রাজনীতির সময় এটা নয়'। মিডিয়া কাদের স্বার্থে ঢাক পেটাচ্ছে সেটা স্পষ্ট হয়, যখন দেখা যায় কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীও ঢাকের তালে তালে একই সুর ধরেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, 'লকডাউন' চলাকালীন এবং সাধারণভাবে করোনা সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে যে স্বাস্থ্যবিধিগুলি মেনে চলা প্রয়োজন, তার অন্যতম বিষয় যেহেতু পারস্পরিক শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করা (যদিও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই শারীরিক দূরত্ব না বলে সামাজিক দূরত্ব বলা হচ্ছে, যা একই সাথে শারীরিক ও মানসিক দূরত্ব সূচিত করে) তাই এই সময়কালে জমায়েত ধর্মী রাজনৈতিক কর্মসূচীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। কিন্তু 'রাজনীতি কোরো নো' কথাটির ব্যঞ্জনা যদি শুধুমাত্র এই নির্দেশিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে বলার কিছু ছিল না। কারণ এই সময়কালে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলি শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই জমায়েতধর্মী সভা-সমাবেশের কর্মসূচী থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের নির্দেশিকাতেই রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই সংক্রান্ত সরকারী নির্দেশিকা এবং 'এই সময় রাজনীতি করা উচিৎ নয়' বলে সাধারণভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার ও পুনঃপ্রচার করা হচ্ছে—এই দুটি বিষয় তাৎপর্যের দিক থেকে কখনোই এক নয়। রাজনীতি না করার যে নিদান, তা আলটপকা বলে ফেলা কোনো মন্তব্য নয়। বহু আগে থেকেই চালু হওয়া একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘনীভূত রূপ মাত্র। এই পরিকল্পনার যারা হোতা, করোনা প্যানডেমিক তাদের স্বাভাবিক গতির তুলনায় দ্রুততর গতিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। লক্ষ্যটি হলো, গোটা সমাজকে 'ডি-পলিটিকালাইস্‌ড' বা 'বি-রাজনীতিকরণ' করে ফেলা।

এই বি-রাজনীতিকরণ পরিকল্পনার সূচনা, নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার গোড়ার পর্ব থেকেই। কিন্তু কেন? আসলে, অর্থনীতির ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা উপরিকাঠামোসমূহের অন্যতম হলো 'রাজনীতি'। ফলে অর্থনীতির কাঠামোতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটলে, উপরিকাঠামোগুলিতেও তার অভিঘাত অনুভূত হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে এই অভিঘাত অনুভূত হবে, তা বলাই বাহুল্য। অভিঘাতের চরিত্রটি অনুধাবন করলেই, 'বি-রাজনীতিকরণ' পরিকল্পনার মূল কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। পূর্ববর্তী 'মিশ্র অর্থনীতি' বা 'জনকল্যাণকামী অথনীতির' সাথে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির মূল পার্থক্য হলো, এখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমসঙ্কুচিত হয়, চাহিদা-যোগান নির্ভর বাজার হয় অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। আবার, রাষ্ট্র ও নাগরিকত্বের আন্তঃসম্পর্কই হলো রাজনীতির অক্ষ। রাষ্ট্র ও নাগরিকবৃন্দের পরস্পর অভিমুখী আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, অধিকার ও কর্তব্যের পরিসরই রাজনীতির এজেন্ডা নির্ধারণ করে। এখন রাষ্ট্রের বহুস্তরীয় এবং বহুবিভাগীয় কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে, তার ভূমিকা পালনের বাহ্যিক আড়ম্বরকে বজায় রেখে, অন্তর্বস্তুর দিক থেকে রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলা হয়, তাহলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের আন্তঃসম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রত্যাশা পূরণে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা, রাজনীতির পরিসরে নাগরিক সমাজের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে। গণ সক্রিয়তার বর্ধিত চাপের মুখোমুখি হতে হয় রাষ্ট্রকে।

রাষ্ট্র সার্বভৌম কিন্তু স্বয়ম্ভূ নয়। নাগরিকের চোখে রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসকবর্গ। আধুনিক সমাজে শাসক মানে কোনো রাজাধিরাজ নন। শাসক মানে কোনো রাজনৈতিক দল বা একাধিক দলের জোট। অর্থাৎ তাদেরও টিঁকে থাকা ও শক্তি বৃদ্ধির রসদ সংগ্রহ করতে হয় সেই রাজনীতির জমি থেকেই, যেখানে রাষ্ট্রের ক্রমসঙ্কুচিত ভূমিকার ব্যস্তানুপাতে বৃদ্ধি পায় নাগরিক সক্রিয়তা। শাসকবর্গের কাছে এ এক উভয় সঙ্কট। একদিকে শ্রেণী স্বার্থে ভূমিকা পালনে দায়বদ্ধতা (রাষ্ট্রের ভূমিকা সঙ্কোচন), অপরদিকে শ্রেণী স্বার্থে ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতা। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন জনসমর্থন, কিন্তু জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে, জনসমর্থন লাভ কী করে সম্ভব? সম্ভব তখনই যদি জনচেতনার সামনে একটা ধুম্রজাল তৈরি করা যায়। এই ধুম্রজালটির নামই বি-রাজনীতিকরণ।

'বি-রাজনীতিকরণ' একটি 'অবজেকটিভ' প্রসঙ্গ। 'সাবজেকটিভ' নয়। 'সাবজেকটিভলি' রাজনৈতিক দল থাকবে, তাদের প্রচার কর্মসূচী থাকবে, পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিরোধিতা থাকবে, নির্বাচন হবে, নির্বাচনে জয় পরাজয় হবে—বাহ্যত সবই ঠিক থাকবে। কিন্তু অন্তর্বস্তুতে প্রকৃত রাজনীতির পরিবর্তে থাকবে ব্যক্তি প্রশস্তি, ব্যক্তি কুৎসা, রাজনৈতিক খেউড়, মিথ্যা প্রচার, তথ্য গোপন, তথ্য বিকৃতি ইত্যাদি। এত কিছুর পরেও যদি নাগরিক সমাজের সচেতনতা মাথা তুলতে চায়, তখন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক উগ্র দেশপ্রেমের ঠুলি নাগরিকের চোখে পড়িয়ে দিতে চায়।

গত তিন দশক ধরে এই সমস্ত পরিকল্পনা সর্বাংশে না হলেও, অনেকাংশে সফল হয়েছে। তবুও কোভিডের সময় এই পরিকল্পনার স্বাভাবিক গতিকে ত্বরান্বিত করার নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, নয়া উদারবাদী ঝড়ের দাপটে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার সম্বলগুলি নুড়ি-পাথরের মতো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে গড়াচ্ছিল। কিন্তু কোভিড ও তদ্‌জনিত লকডাউনের ধাক্কায় সেই পাহাড়ের গায়ে রীতিমতো ধস নেমেছে। হুড়মুড় করে নীচের দিকে ভেঙে পড়ছে সবকিছু। দ্বিতীয়ত, মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে দুর্বল করার, মানুষে মানুষের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করার এত দীর্ঘ আয়োজন সত্ত্বেও, কোভিড ও লকডাউন পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি, নিরন্ন মানুষের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা, বিভিন্ন মহল্লায় কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে যূথবদ্ধতার বীজ রোপন প্রভৃতি বিপরীতমুখী স্রোত ধীরে হলেও বইতে শুরু করেছে। আর মানবিকতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবিক উপাদানগুলিই তো প্রকৃত রাজীনতির আঁতুড় ঘর।

প্রশ্ন উঠতে পারে এর মধ্যে নতুন কী আছে? যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই তো এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এটা ঠিক, তবু একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে বিপর্যয়-উত্তর স্বাভাবিক অবস্থায়, সংগঠিত মানবিক উদ্যোগ শুরু হয়। অর্থাৎ একদিকে স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা নির্বাহ, ও তারই ফাঁকে ফাঁকে সহযোগিতার কর্মসূচী—যা ত্রাণ পরিকল্পনার ধারণার বাইরে খুব একটা বেরোতে পারে না। কিন্তু করোনার সংক্রমণ একটা চলমান বিপদ, যা সাহায্যদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট ভেদরেখা আঁকতেই দিচ্ছে না। আজ যিনি সাহায্যদাতা, আগামীকাল তিনিই সংক্রমিত হয়ে বা আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে সাহায্যপ্রার্থী। এমতাবস্থায় উল্লিখিত মানবিক উদ্যোগগুলি 'ত্রাণ প্রকল্প'-র সাধারণ ধারণা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে, যূথবদ্ধতার অঙ্কুরোদ্গম ঘটায়। যা মেহমনতীদের শ্রেণী রাজনীতির বা প্রকৃত রাজনীতির বর্ণপরিচয়।

তাই 'রাজনীতি করো না' এই নিদান আসলে মেহনতীদের শ্রেণী রাজনীতির সলতে পাকানোর কাজটাকেই ভণ্ডুল করার চক্রান্ত। এবং এটা করা হয় বিপ্রতীপ শ্রেণী রাজনীতি, অর্থাৎ লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট স্বার্থবাহী শ্রেণী রাজনীতিকে নিরঙ্কুশ করার স্বার্থেই।

এক কথায়, এ এক ভয়ঙ্কর শ্রেণী চক্রান্ত। একে পাল্টা আঘাত হানার জন্য প্রয়োজন সাঁড়াশি আক্রমণ। একদিকে যূথবদ্ধতার ভিত্তিতে ধারাবাহিক মানবিক উদ্যোগ নিয়ে যখনই যিনি বিপন্ন হচ্ছেন, তাঁর পাশে দাঁড়ানো, অপরদিকে প্রকৃত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলি নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনেও রাস্তায় নামা। পশ্চিমবাংলা প্রতিনিয়ত এই দ্বি-বিধ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে। এর পরিসরকে আরও বৃদ্ধি করে 'রাজনীতি কোরো না'-র শঠতাপূর্ণ রাজনীতিকে পরাস্ত করতে হবে। □

২৫ জুলাই, ২০২০

অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির নেতৃত্বের যৌথ সভা

বর্তমান পরিস্থিতিজনিত সামগ্রিকতার নিরিখে এই মুহূর্তে জরুরি করণীয় বিষয়গুলি নির্ধারণের জন্য গত ১৮ জুলাই, ২০২০ তারিখে অন্তর্ভুক্ত সমিতির নেতৃত্বের উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সভা করা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ— ১. করোনা ভাইরাস সংক্রমণে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রান্তিক অসহায় মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচী জারি রাখতে হবে। তহবিল সংগ্রহ অভিযানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। যেসব সহকর্মী লকডাউনের মধ্যে তহবিলে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি তাদের কাছে পৌঁছে তহবিল সংগ্রহ অভিযান সার্বিকভাবে সফল করতে সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ২. এই কাজে একাংশের নবীন কর্মচারী উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। আবার একাংশের নেতৃত্ব-কর্মী এই সময়কালে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকেছেন, তাদেরকে কাজে যুক্ত করতে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। ৩. গত ১২ জুলাই, ২০২০ তারিখে কেন্দ্রীয় রক্তদান শিবিরে পর্যাপ্ত কিটের অভাবে অনেকে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রক্তদান করতে পারেননি। পরিস্থিতির চাহিদামতো পুনরায় কেন্দ্রীয় রক্তদান শিবির করা হতে পারে। ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ কর্মসূচী করতে হবে। ৪. সংগঠনের প্রাথমিক কাজ যেমন সদস্য সংগ্রহ, মুখপত্রের গ্রাহক ভুক্তি সম্পন্ন ও প্রকাশ করা, স্বাস্থ্য বিধি মেনে কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি দৈনন্দিন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন শুরু করতে হবে। ৫. এই সময়ে সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার ই-সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাও দ্রুত প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে, অনেক অন্তর্ভুক্ত সমিতি এই পদ্ধতিতে মুখপত্র প্রকাশ করেছেন, যা অভিনন্দনযোগ্য। পরিস্থিতির নিরিখে অন্যান্য সমিতিগুলিকেও এই পদ্ধতিতে মুখপত্র প্রকাশে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। ৬. সমিতি / জেলা / অঞ্চল দপ্তরে উপস্থিত হয়ে সাংগঠনিক কাজ শুরু করতে হবে। নেতৃত্বদের এই কাজে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ৭. প্রশাসনিক ও সামাজিক ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে সংগঠনের সব স্তরে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে। ৮. পরিস্থিতির ভয়াবহতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের ওপর শাসক শ্রেণীর আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একে প্রতিহত করতে আন্দোলনের তীব্রতাও বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মেনে আগামী দিনের সংগ্রামে নিজেদের যুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ, অরণ্য সপ্তাহ পালনের মতো সামাজিক কর্মসূচীতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হবে। ৯. রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে একাধিক কর্মচারী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন। এমত পরিস্থিতিতে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আক্রান্ত দপ্তরের কর্মচারীদের করোনা পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সমিতি ও জেলা / অঞ্চল নেতৃত্বকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। (এই বিষয়ে ইতিমধ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে)। প্রয়োজনে এই দাবি নিয়ে দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন দিতে হবে। বর্তমান এই জটিল পরিস্থিতিতে কর্মচারী ও তার পরিবার সর্বোপরি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে আমাদের এই সাংগঠনিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। □

তৃণমূল সরকারের আমলে সিইএসসি-তে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি

২০১০-১১সালে ৪ টাকা ৭৩ পয়সা (২০১১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ২০০ ইউনিটের উপর বামফ্রন্ট ভর্তুকি দিয়েছিল)।

২০১১-১২ সালে ৫ টাকা ৮৮ পয়সা

২০১২-২০১৩ সালে ৬ টাকা ৩ পয়সা

২০১৩-২০১৪ সালে ৬ টাকা ১০ পয়সা (৮৮ MVCA যুক্ত হয়েছিল)

২০১৪-২০১৫ সালে ৬ টাকা ৯৭ পয়সা

২০১৫-২০১৬ সালে ৬ টাকা ৯৯ পয়সা

২০১৬-২০১৭ সালে ৭ টাকা ২ পয়সা (২৭ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে MVCA বাবদ ২৯ পয়সা প্রতি ইউনিয়টের বৃদ্ধি পেয়েছে)

২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ সালে বিদ্যুতের দাম বাড়েনি, কেবল ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে MVCA বাবদ ২৯ পয়সা প্রতি ইউনিটে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তার আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এভাবে ঘটেনি। বরং কমেছে। যখন বেড়েছে সেই বাড়ার পরিমাণ কম।

২০০৩-২০০৪ সালে ৪ টাকা ১৫ পয়সা

২০০৪-২০০৫ সালে ৪ টাকা ০৩ পয়সা

২০০৫-২০০৬ সালে ৩ টাকা ৮১ পয়সা

২০০৬-২০০৭ সালে ৩ টাকা ৭৪ পয়সা

২০০৭-২০০৮ সালে ৩ টাকা ৮৬ পয়সা

২০০৮-২০০৯ সালে ৩ টাকা ৯১ পয়সা

২০০৯-২০১০ সালে ৪ টাকা ৫৬ পয়সা।

গত ১০ বছরে সিইএসসি-র মুনাফা বেড়েছে উচ্চহারে।

২০১০ সালে ৪৩৩ কোটি টাকা

২০১১ সালে ৪৮৮ কোটি টাকা

২০১২ সালে ৫৫৪ কোটি টাকা

২০১৩ সালে ৬১৮ কোটি টাকা

২০১৬ সালে ৮৪৫ কোটি টাকা

২০১৭ সালে ৮৬৩ কোটি টাকা

২০১৮ সালে ৯৩৭ কোটি টাকা

২০১৯ সালে ৯১৮ কোটি টাকা

করোনা মোকাবিলা

অন্ধকারে আলোর দিশা—কেরলা

মানস কুমার বড়ুয়া

দেশের শাসক দল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের পক্ষ থেকে করোনা মোকাবিলার দাওয়াই হিসাবে নানা অবৈজ্ঞানিক বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। কখনও বলা হচ্ছে, থালা-বাটি বাজাতে, কখনও বলা হচ্ছে প্রদীপ জ্বালাতে, আবার কেউ কেউ গোমূত্র সেবনের কথাও বলছেন। তখন শুধুমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সরকার নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা আরোপ করে, জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সুসংবদ্ধ করে দেশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য কেরালা করোনার সংক্রমণ মোকাবিলায় একটা নিজস্ব মডেল তৈরি করে সাফল্য পেয়েছে। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে গত ২৪ জুন '২০ কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতি কে কে শৈলজাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ঐ দিনটি ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষিত বিশ্ব গণপরিষেবা দিবস (ইউ এন পাবলিক সার্ভিস ডে)।

কেরালাতে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্তের খোঁজ মেলে এই বছরের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখ। সেই রোগী ছিলেন চীনের উহান ফেরত। সেইদিন থেকে কঠোরভাবে কোয়ারেন্টাইন বিধিকে মান্যতা দিয়ে এবং আনুসঙ্গিক অন্য বিষয়গুলি প্রতিপালন করে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে কেরালা। সলতে পাকানোর কাজ অবশ্য তার আগে থেকে শুরু হয়। প্রথম পর্বে ঝুঁকিপূর্ণ রোগীর ক্ষেত্রে ১৪ দিনের পরিবর্তে ২৮ দিন কোয়ারেন্টাইন বিধি কঠোরভাবে আরোপিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য করোনাশূন্য কখনোই হতে পারে না, যদি না সারা দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সমস্ত রাজ্যগত উদ্যোগে কোনো ধরনের সমতা না থাকে। কেরালা সামলেছে লক্ষ লক্ষ দেশীয় পরিযায়ী শ্রমিকদের আগমনজনিত সমস্যাকে। এছাড়াও মূলত আরব দেশগুলিতে থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিক ও কেরালাবাসীদের নিয়ে আসা সংক্রমণের ঝুঁকিকে সামলাতে হয়েছে। সমস্ত কাজটাই অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করেছে কেরালার বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার। কেরালার কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইটা বহুমাত্রিক। প্রথম লড়াইটা অবশ্যই করোনা ভরইরাসের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের বিরোধী দল যারা সর্বক্ষণ বিরোধিতার নামে নানা কুৎসা করে কেরালা সরকারের উদ্যোগকে বিপথগামী করতে ব্যস্ত, তাদের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের নানা ধরনের বৈষমম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে।

কেরালার কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং আছে। এই তিনটি পদক্ষেপ হলো—১) কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা, (২) আক্রান্ত মানুষের পাশে ত্রাণ ও সাহায্য পৌঁছে দেওয়া। (৩) রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ও মানুষের কল্যাণে মধ্যবর্তী ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কেরালা সরকারের কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল নীতি হলো সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কাজকে ভিত্তি করে বা অগ্রাধিকার দিয়ে সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধন। কারণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষই সমগ্র জনগণের একটা বড় অংশ।

কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ ঠেকানোটাই ছিল মৌলিক লক্ষ্য। কেরল সরকার এই কাজে দেশের অন্যান্য রাজ্য শুধু নয়, অনেক উন্নত দেশের থেকে এগিয়ে ছিল শুরু থেকেই। দেশের প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ কেরালাতে পাওয়া যায় ৩০ জানুয়ারি ২০২০-তে। একজন ছাত্রের দেহে, যিনি চীনের উহান প্রদেশ (যাকে এই অতিমারীর উৎস কেন্দ্র বলা হচ্ছে) থেকে এসেছিলেন। কিন্তু এই ভাইরাস সংক্রমণ রোধের লক্ষ্যে ঐ রাজ্যে তারও আগে শুরু হয়েছিল। কার্যত হু সারা পৃথিবীব্যাপী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা (গ্লোবাল হেল্‌থ এমারজেন্সি) ঘোষণা করার বহু আগেই কেরালা করোনা সংক্রমণকে রোখার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

রাজ্যস্তরে একটি কন্ট্রোল সেল গঠিত হয় ২৫ জানুয়ারি, ২০২০। রাজ্য স্তরে র‍্যাপিড রেসপনস্ টিম স্থাপিত হয় এবং সেই টিম দক্ষতার সাথে পাবলিক হেলথ এমারজেন্সি প্ল্যান তৈরি করে কোভিড-১৯ সংক্রমণ চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই সংক্রান্ত বিষয়ে হু-এর প্রস্তাব ও পরামর্শ প্রতিটি জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তা কার্যকরী করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কোনো ভ্যাকসিন বা ঔষধ যেহেতু ছিল না, সম্বল বলতে কেরালা সরকারের কাছে ছিল শুধু চালু জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো। তাকে ব্যবহার করে রাজ্যের ১২৯৬টি সরকারি হাসপাতালে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০৬টি শয্যা তৈরি করা হলো শুধু করোনা আক্রান্তদের জন্য। পাশাপাশি ২৩৭৮টি ভেন্টিলেটর স্থাপিত হলো সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে। যদি সংক্রমণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায় তাকে মোকাবিলার জন্য রোগীদের থাকার ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি আবাসন বা বড় বাড়ি চিহ্নিত করা হয়। কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ, জেনারেল হাসপাতাল ও প্রধান প্রধান বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হলো।

সংক্রমণ রোধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে সরকারের উদ্যোগে সবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, মাস্ক পড়া ইত্যাদি প্রচারের কর্মসূচী নেওয়া হয়, যার নাম দেওয়া হয় "শৃঙ্খল ভেঙে দাও" (ব্রেক দ্য চেইন)। জনগণের মধ্যে এই প্রচার ব্যাপক সারা ফেলে। মাস্ক পড়ে বাইরে বের হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

কোভিড-১৯ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ১৬টি জায়গায়। নিরাপদভাবে এবং দ্রুততারসাথে নমুনা সংগ্রহের জন্য "ওয়াক-ইন কিয়স্ক" চালু হয়। দূরদূরান্তের কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে আনা এবং সুস্থ হওয়া ব্যক্তিকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়। রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানষের সুবিধার্থে একটি কল সেন্টার চালু হয়। নাম দেওয়া হলো 'দিশা'। কয়েক লক্ষ মানুষ 'দিশা'কে ব্যবহার করেছেন। কোয়ারেন্টাইন থাকা মানুষদের দেখভালের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কেরালার বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারের এই রোগ মোকাবিলায় আরেকটি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। যেটা সারা দেশ বেনজির। আইসোলেশন অথবা কোয়ারেন্টাইন থাকা মানুষদের মানসিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রতিটি জেলাতে 'মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী' (ডিস্ট্রিক্ট মেন্টাল হেল্‌থ প্রোগ্রাম) নেওয়া হয়। এই সকল মানুষকে মানসিক-সামাজিক (সোসিও-সাইকোলজিক্যাল) সমস্যা থেকে সাহায্য করার জন্য ১০৬৯ জন মানসিক স্বাস্থ্য কর্মী জেলাগুলিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। এমনকি করোনা রোগীদের সেবার লক্ষ্যে যারা রত, তাদের মানসিক ও শারীরিক চাপ দূর করার জন্য টেলিকাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মে মাস পর্যত সোসিও সাইকোলজিকাল টিম মোট ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ২৬৩টি টেলি কাউন্সেলিং কল আদান প্রদান করেছেন।

কেরালায় কোভিড-১৯ মোকাবিলার সরকারী উদ্যোগটি ছিল সম্মিলিত উদ্যোগ। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এই কার্যকলাপ সূচনা করলেও অতি দ্রুত অন্য সব দপ্তরও এতে যুক্ত হয়। বিভিন্ন দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগেই কোভিড-১৯ প্রকোপ রোখার ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ছিলেন এর নেতৃত্বে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী সব দপ্তরগুলি, বিশেষত স্বাস্থ্য ও রাজস্ব দপ্তর নিয়ে সভা করতেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী নিজে জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদিনকার বক্তব্যের বিষয়ের মধ্যে থাকতো সংক্রমণ বৃদ্ধির তথ্য; সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ, আক্রান্তদের ত্রাণ ও সহায়তা প্রদানের তথ্য। জনগণের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

এই ধরনের বহুমাত্রিক উদ্যোগের ফলে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় কেরালা অনেকাংশে সফল হয়েছে। কোভিড-১৯ রোগী মৃত্যুর গড় হার গোটা দেশে জুন মাসের শুরুতে যেখানে ছিল ৩.১৬ শতাংশ, কেরালায় তা ছিল মাত্র ০.৫১ শতাংশ। জনসংখ্যা প্রতি কোভিড টেস্টের হারের ক্ষেত্রেও কেরালা সবার আগে। যে সময়টায় উন্নত দেশগুলি বৃদ্ধ বয়সীদের চিকিৎসা দিতে প্রস্তুত ছিল না, সেই সময় আমাদের দেশের ছোট্ট একটা অঙ্গরাজ্য কেরালাতে ৯১ বছর ও ৮৮ বছর বয়স্ক দুই বৃদ্ধ করোনা রোগী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ৮ জন বিদেশী করোনা রোগী কেরালায় সুস্থ হয়ে সেখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও প্রশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কেরালা সরকারের কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত লকডাউন ও অন্যান্য পদক্ষেপের ফলে বিপদে পড়া বিভিন্ন অংশের মানুষের সহায়তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ। রাজ্য সরকার প্রথমেই এই সঙ্কটের ফলে যারা জীবিকা হারিয়েছেন বা অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ত্রাণ ও সহায়তার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করে। অতীব সামাজিক সুরক্ষা পেনশন দেওয়া হয় ৫০ লক্ষ মানুষকে। এর জন্য ব্যয় করা হয় ৪৭০৯ কোটি টাকা। ওয়েলফেয়ার বোর্ডগুলির পক্ষ থেকে ৭৩ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

রেল ও কয়লা ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ

দেবাশীষ রায়

ভারতীয় রেলের বাছাই করা রুটে বেসরকারী ট্রেন চালানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রায় এক বছর আগেই নিয়েছিল রেল। দেড়শোটি রুটে এমন ট্রেন চলবে, জানা গিয়েছিল রেল বোর্ডের মাধ্যমে। এবার রেলবোর্ড দরপত্রের আহ্বান জানালো। করোনা মহামারীর মধ্যেই বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া হাতে-কলমে শুরু করে দিল রেল।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম ট্রেন চলাচল তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাতে। রেল মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে প্রতিটি ট্রেনে ১৬টি করে কামরা থাকতে হবে, সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার। যোগ্যতার বিশদ জানিয়ে দরপত্র দিতে হবে বেসরকারী সংস্থাগুলিকে। জানা গিয়েছে, আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত যোগ্যতার পাশাপাশি মোট আয়ের কত অংশ সরকারকে দিতে পারবে, দরপত্রে তার উল্লেখ করতে বলা হয়েছে ইচ্ছুক সংস্থাকে।

রেলের বেসরকারীকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত এক বছর আগে হলেও সংসদে তা অস্বীকার করেছিল কেন্দ্র। রেলের বরাদ্দ অনুমোদন বিতর্কে লোকসভায় গত বছরের ১৯ জুলাই রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, রেলের বেসরকারীকরণ করা হবে না। তবে পরিষেবা উন্নত করতে আউটসোর্সিং হবে। নতুন বিনিয়োগ টানার ব্যবস্থা করা হবে।

বেসরকারী যাত্রীবাহী ট্রেন প্রসঙ্গে কেন্দ্রের দাবি বেসরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে রেলে ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য, আধুনিক প্রযুক্তির কোচ নিশ্চিত করা। নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের সময় কমানো যাবে এই সিদ্ধান্তে। কমবে পরিচালনার খরচ। কেন্দ্র যদিও জানিয়েছে যে বেসরকারী সংস্থাগুলিকে চালক এবং গার্ড জোগাবে ভারতীয় রেলই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে মানুষের পয়সায় বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা রেলের কাঠামো ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য খুলে দিচ্ছে রেল। যাত্রীবাহী ট্রেনের খরচ বাবদ ঘাটতি মেটানো হয় পণ্য মাশুল থেকে। এক্ষেত্রে খরচের গোটা দায় সরাসরি জনতার ওপর চাপিয়ে দেবে বেসরকারী সংস্থাগুলি। ভাড়া হু হু করে বাড়তে বাধ্য। দিল্লী মেট্রোর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নেতৃত্ব দেওয়া ই শ্রীধরণ একটি সাময়িকীকে বলেছিলেন, বেসরকারী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত নয়। এই সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। একাংশ তুলেছেন বেসরকারী বিমান পরিষেবায় চরম অব্যবস্থার নানা নজিরও।

কেন্দ্রের ঠিক করে দেওয়া ১২টি ক্লাস্টারের একটি হাওড়া। তার মধ্যে ৯টি রুটে মোট ১১ জোড়া ট্রেন রয়েছে। পুরী এবং রাঁচী রুটে যাওয়া-আসার জন্য রয়েছে দু'জোড়া করে ট্রেন দরপত্রের আহ্বান। পাটনা ক্লাস্টারে আসানসোল থেকে পুরী এবং সুরাট রুটে যাওয়া আসার দু'জোড়া ট্রেনের জন্যও চাওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার দরপত্র। মুম্বাইয়ে দুটি ক্লাস্টার করা হয়েছে। তার একটিতে হাওড়া-মুম্বাই রুটে একজোড়া ট্রেন বেসরকারীর হাতে দেওয়া হচ্ছে। অন্য ক্লাস্টারগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লীর দুটি, চণ্ডীগড়, প্রয়াগরাজ (এলাহাবাদ), সেকেন্দ্রাবাদ, জয়পুর, চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরু।

দেশজোড়া প্রবল সমালোচনার মুখে পরবর্তীতে সাংবাদিক সম্মেলনে সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ভি কে যাদব। বেসরকারী রুটে যে ভাড়া বাড়ছে, তা নিশ্চিতও করে দেন তিনি। যাদব জানিয়েছেন, ভাড়া ঠিক করা হবে সংশ্লিষ্ট রুটে বিমান এবং এসি বাসের ভাড়ার তুলনা করে। তাঁর দাবি, দেশে এখন ২৮০০ মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন চালায় রেল। তার পাঁচ শতাংশ বেসরকারী হাতে যাবে। বিদ্যুৎ এবং রেলপথের মাশুল বাবদ বেসরকারী সংস্থার থেকে টাকা পাবে রেল। অন্য যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির জন্য সেই টাকা ব্যবহার করা হবে। বিনিয়োগ বাড়বে, পরিষেবা উন্নততর হবে। পণ্য মাশুলের আয় থেকে যাত্রীবাহী ট্রেনের ঘাটতি মেটাতে হবে না। আর্থিক দরপত্র আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আশা করছে রেল। চূড়ান্ত করা যাবে এপ্রিলে। ইতিমধ্যেই যাত্রীবাহী ট্রেন কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আদানি পোর্ট, টাটা রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এসেল গ্রুপের মতো নামিদামী কর্পোরেট সংস্থা।

মোদী সরকারের এই নীতির সামনে বাধার প্রাচীর তৈরি করতে বদ্ধপরিকর শ্রমিক সংগঠনগুলি। রেলের বেসরকারীকরণ রুখতে হবে প্রতিরোধের প্রাচীর তৈরি করে, ঘোষণা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির। তাদের অবস্থান, কোনোভাবেই রেলের বেসরকারীকরণ হতে দেওয়া যাবে না। ইতিমধ্যে দেশজুড়ে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন, বিভিন্ন ডিভিশনের সদর দপ্তরে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। কলকাতায় পূর্ব রেলের সদর দপ্তর ছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে ট্রেড ইউনিয়নসহ রেলের বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন। আগামীদিনেও চলবে স্টেশনে স্টেশনে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, রেলের বেসরকারীকরণ হলে অর্থনীতির বুনিয়াদী ব্যবস্থার উপর তা হবে আক্রমণ। ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম মেরুদণ্ড রেল। একই সঙ্গে রেল জাতীয় ঐক্য রক্ষা করে, অর্থনৈতিক লেনদেন সুনিশ্চিত করে। বেসরকারীকরণের অর্থ হলো, ক্রেতাদের হাতে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে জনগণের টাকাই জোগাবে সরকার। জনগণের সম্পত্তি বেসরকারী হাতে যাবে, জনগণের টাকা ব্যবহার করে। এটা কিছুতেই দেশের শ্রমজীবী মানুষ মেনে নেবেন না। সর্বোচ্চ প্রতিরোধে রোখা হবে বেসরকারীকরণ।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, 'আত্মনির্ভরতা'র শ্লোগান দিয়ে চলা সরকারের এই পদক্ষেপে স্বনির্ভরতার ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। কাজ খোয়ানোর আশঙ্কা রয়েছে রেলের কয়েক লক্ষ কর্মীর। ভারতীয় রেল দেশে যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কোটি কোটি মানুষকে সরকারী পরিবহণ পরিষেবা দেয় রেল। রেলের উপর দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবিকা নির্ভর করে আছে। ইতিমধ্যেই আইআরসিটিসি-র মাধ্যমে টিকেটিং ব্যবস্থাকেই বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই দেশের জনগণের সম্পত্তিকে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া যাবে না।

লকডাউনের মধ্যেই আনলক দেশের কয়লাক্ষেত্র

১৮ জুন হাসি হাসি মুখে দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং 'আত্মনির্ভরতা'র নামে জাতীয় সম্পদকে তুলে দিয়েছেন দেশি-বিদেশী মুনাফাখোর কর্পোরেটদের হাতে। 'দশকের পর দশক কয়লা ক্ষেত্র ছিল লকডাউনে, দুনিয়ার মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ কয়লার ভাঁড়ার এদেশে, খুলে দেওয়া হলো বেসরকারির হাতে', ৪১টি কয়লা ব্লকের ই-অকশন উদ্বোধন করে বলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

এতটুকু বলেই থামেননি মোদী। খুল্লামখুল্লা মোদীর স্বীকারোক্তি, 'করোনা যুদ্ধে ভারত জিতবে এবং সঙ্কটকে বদলে দেবে সম্ভাবনায়'। বেসরকারী মুনাফার সম্ভাবনা। যথারীতি বেনজির উল্লাসে কর্পোরেট মহলে।

মোদীর সঙ্গেই ই-অকশনে হাজির ছিলেন কয়লা ব্লক নিলামের অন্যতম উদ্যোক্তা ফিকির সভাপতি সঙ্গীতা রেড্ডি, টাটা সনস'র কর্ণধার চন্দ্রশেখরণ, বেদান্ত গ্রুপের মালিক অনিল আগরওয়াল। 'পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি নির্মাণে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, বলেছেন টাটা সনস'র চন্দ্রশেখরণ।

১৮ জুন দেশের ৫৪১টি কয়লা ক্ষেত্রের নিলামের দিন বসেছিলেন না কয়লা ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীরা। যেদিন কয়লা ব্লক নিলামে চড়িয়েছেন মোদী, সেদিনই ধর্মঘটর নোটিশ ধরিয়েছেন শ্রমিকরা। কোল ইন্ডিয়ার প্রতিটি সাবসিডিয়ারি দপ্তরে হাজার হাজার কয়লা শ্রমিক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষকে ধরিয়েছেন ধর্মঘটের নোটিশ।

কোনোভাবেই দেশের জাতীয় সম্পদ কয়লাকে দেশি-বিদেশী কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে দেবেন না শ্রমিকরা। ২ জুলাই থেকে ৪ জুলাই টানা তিনদিন ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন তারা। কয়লা ক্ষেত্র বাঁচাতে বেনজির শ্রমিক ঐক্য। প্রতিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে শামিল আরএসএস'র বিএমএস'ও।

লকডাউনের মধ্যেই এই প্রথম মোদী সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে শ্রমিকশ্রেণী।

নতুন পর্যায়ে প্রবেশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের। সরকার নিলাম চড়াতে পারে, তা ভেস্তে দেবেন শ্রমিকরা। প্রতিরোধ আর অবাধ্যতায়।

এর আগেও বার বার চেষ্টা হয়েছে কয়লা ক্ষেত্রকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার। মনমোহন সিং-এর তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার কয়লা খনির 'ক্যাপটিভ মাইনের' নাম করে ২১৪ ব্লক বণ্টনসহ ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রির দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমনকি এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কয়লা শ্রমিকরাও শেয়ার কিনতে চাইলে তাঁরাও তা কিনতে পারবেন। কিন্তু একজন শ্রমিকও কয়লা খনির শেয়ার কিনতে আসেননি, উল্টে এই শেয়ার বিক্রি করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কয়লা শ্রমিকরা ৫ মে ২০১০-এ কয়লা শিল্পে বৃহত্তম হরতাল সংগঠিত করেন। ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশে বাতিল হয় ২১৪টি ক্যাপটিভ ব্লক।

মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেই 'কোল মাইনস (স্পেশাল প্রভিশান) অ্যাক্ট-২০১৫' চালু করলেও নিলামে খরিদ্দার পাওয়া যায়নি কিছু শর্তের কারণে। প্রথমত, যে কোম্পানিগুলো যে কয়লা ব্লক নিলামে কিনবে তাদের কয়লা খনন করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, যারা এই কয়লা ব্লক নিলামে কিনবে তাদের একমাত্র ভারতীয় কোম্পানী হতে হবে। বিদেশের কোনো কোম্পানী যদি কয়লা ব্লক নিলামে কিনতে আসে, তাহলে তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারে অনুমতি নিতে হবে। তৃতীয়ত, এই ব্লক যারা নেবে, তাদের সেই নির্দিষ্ট সমস্ত কয়লা ব্লকে যত কয়লা মজুত আছে, সেই মজুতের উপর যা দাম ঠিক হবে সেই দামের ৪ শতাংশ অগ্রিম দিয়ে কয়লা ব্লক কিনতে হবে।

২০১৯ সাল পর্যন্ত খরিদ্দার না পাওয়ার কারণেই মরিয়া হয়ে ওঠে মোদী সরকার। দি মিনারেল ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০২০ পাশ হয়ে যায় জানুয়ারি মাসে। আর মহামারীকে কাজে লাগিয়েই বেসরকারী মুনাফার দরজা খুলে দেওয়া হলো।

নয়া আইনে আগের সমস্ত বাধা খারিজ। প্রথমত, যারা কয়লা ব্লক নিলামে অংশ নেবে, সেইসব মালিকের কয়লা খননের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলবে। দ্বিতীয়ত, যারা কয়লা ব্লক নিলামে অংশ নেবে তারা দেশি-বিদেশী যে কেউ হতে পারে। তৃতীয়ত, এখন থেকে কয়লা ব্লক নিলামে যারা অংশ নেবে তাদের ওই নির্দিষ্ট ব্লক নেওয়ার আগে মোট মজুত কয়লার দামের ৪ শতাংশ অর্থ আগাম দিতে হবে না। সরকার কয়লার যা দাম নির্ধারণ করবে সেই দামে (ফ্লোর ভ্যালু) বা তার থেকে বেশি দামেও বিক্রি করে তারপর সরকারের নির্ধারিত দামের ৪ শতাংশ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

কমরেড লেনিন আজও প্রাসঙ্গিক

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

মহামতি কমরেড লেনিনের সার্ধ শতবর্ষ সবে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম হলো ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। তিনি ১৮৭০ সালের ১০ এপ্রিল (২২ এপ্রিল) রাশিয়ার মহানদী ভোলগার তীরে সিমবির্স্ক শহরে (পরে নামকরণের হয় ইলিয়ানভস্ক) জন্মগ্রহণ করেন। ভোলগা তীরের সিমবির্স্ক, কাজান, সামারা শহরের বিস্তৃত পটভূমিকায় তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়।

লেনিনের পিতা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ইলয়ানভ। বাল্যকাল থেকেই অভাব অনটনের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে। কিন্তু নিজের অধ্যবসায়, মেধা এবং তাঁর দাদার সহায়তায় তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং পরে সিমবির্স্ক গুবের্নিয়া অঞ্চলে স্কুল পরিচালক হন। সমকালীন সময়ে তিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল মানুষ, জনশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তাঁর অবদান ছিল বিপুল। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষকদের অনেক সাহায্য করেন। ভোলগা তীরের অ-রুশ অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি তিনি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন।

ছাত্রজীবনে বিপুল পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে ভ্লাদিমির মহান রুশ লেখকদের রচনার সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পুশকিন, লেরসন্তগ, তুর্গেনেভ, নেক্রানভ, টলস্টয় প্রভৃতি। কিশোর লেনিনের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে ছিল পারিবারিক পরিবেশ এবং প্রগতিশীল রুশ সাহিত্য। সেই সময়ে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল। নতুন প্রযুক্তি ও হাজার হাজার শ্রমিক নিয়ে কলকারখানা আত্মপ্রকাশ করছিল। অবশ্য তখনও ভূমিদাস প্রথার অবশেষ ভালোরকমভাবেই টিঁকে ছিল, সঙ্গে ছিল ভূমিদাসপ্রথার শোষণ। ফলে গ্রাম-শহরের গরিব মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল দুর্বিষহ অবস্থা। জার শাসনের স্বৈরাচার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের দমন-পীড়ন শ্রমিক-কৃষকের দারিদ্র ও অধিকারহীনতা কিশোর ভ্লাদিমির ইলিচের মনে উৎপীড়কদের প্রতি ঘৃণা ও উৎপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি যখন ওপরের ক্লাসের ছাত্র তখনই তার বিপ্লবী ভাবনা প্রকাশ পেতে থাকে। ভ্লাদিমিরের ওপর তাঁর দাদা আলেকজান্দারের খুবই প্রভাব পড়েছিল। দৃঢ়সঙ্কল্প এবং উচ্চ নৈতিক গুণে আলেকজান্দার ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। দাদার মাধ্যমেই ভ্লাদিমির প্রথম মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। কৈশোরে দুর্বিসহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে লেনিনকে যেতে হয়। ১৮৮৬ সালে হঠাৎ তাঁর পিতা মারা যান। এই শোক কাটতে না কাটতেই এলো দ্বিতীয় আঘাত। জার তৃতীয় আলেকজান্দারকে হত্যার চক্রান্তের অপরাধের(!) জন্য পিটার্সবার্গে গ্রেপ্তার হন আলেকজান্দার উলিয়ানভ। এই বছরের মে মাসে স্লিয়েলবুর্গ দুর্গে ফাঁসি হলো আলেকজান্দার উলিয়ানভের। লেনিনের বোন আনা ইলিনিচনা লিখেছেন, "বীরের মতো মৃত্যুবরণ করলেন আলেকজান্দার ইলিচ। রক্ত তার দাবদাহের দ্যুতিতে আলোকিত করে তোলে তাঁর পরের ভাই ভ্লাদিমির ইলিচকে।"

দাদার ফাঁসির ঘটনা লেনিনের জীবনকে আন্দোলিত করে তোলে। বিপ্লবী সংগ্রামে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার আগ্রহ আরও জোরদার হয়ে ওঠে। দাদা ও তাঁর সহকর্মীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি মাথা নত করলেও লেনিন কিন্তু তাঁদের পন্থা বর্জন করেন। তাঁর ধারণা হলো, জার সরকারের স্বতন্ত্র এক একজন প্রতিনিধি এমনকি স্বয়ং জারকে হত্যা করলেও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া যাবে না। তিনি বলেছিলেন, "না, আমরা ওপথে যাব না। ওপথে যাওয়া চলে না।" ভ্লাদিমির উলিয়ানভ গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন শুরু করেন। মার্কস ও তাঁর বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস পুঁজির শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁদের সারা জীবন উৎসর্গ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁরা সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মের আবিষ্কার ও তার প্রতিষ্ঠা করেন।

(১)

লেনিন ১৮৯৩ সালের আগস্টে পিটার্সবুর্গে চলে আসেন। পিটার্সবর্গে সেই সময়ে ছিল রাশিয়ার রাজধানী। একই সাথে তা ছিল দেশের শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠচক্র। এদের সদস্যরা সকলেই মার্কসবাদের চর্চা করতো। অগ্রণী শ্রমিকদের মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ প্রচার করতো। এরকমই একটি চক্রে যোগদান করেন কমরেড লেনিন। অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল উদ্যম ও উদ্দীপনায় লেনিন বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মার্কসবাদের গভীর জ্ঞান ও রুশ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগে দক্ষতা, শ্রমিক আদর্শের অপরাজেয়তায় বিশ্বাস এবং দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। ফলে পিটার্সবুর্গে কমরেড লেনিন মার্কসবাদীদের স্বীকৃত নেতা হয়ে উঠলেন। পার্টির দীর্ঘদিনের পুরোনো সদস্য গ.স. ক্রজিজানভস্কি তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "হঠাৎ আমাদের উত্তরের সমভূমিতে অসাধারণ একজন মানুষের উদয় হলো, যিনি মার্কসের প্রতিভায় পিটিয়ে তোলা হাতিয়ারটির শক্তি যেমন বুঝতেন, তেমনটি আর কেউ বুঝতে পারতো না। তাঁর কাছে মার্কসবাদ হলো বিপ্লবী মতবাদ।"

পিটার্সবুর্গে লেনিন যখন কাজ শুরু করেন সেই সময়ে সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে রাশিয়ায় শিল্পোন্নয়নের জোয়ার তৈরি হয়। নতুন নতুন কলকারখানা আত্মপ্রকাশ করে। দ্রুত বেড়ে ওঠে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা এগিয়ে আসে। শ্রমিক শ্রেণীর নিজের ভূমিকা পালন করতে হলে দরকার স্বাধীন বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। পিটার্সবুগে মার্কসবাদীদের কাছে লেনিন এইরকম একটি পার্টি গঠনের বক্তব্য হাজির করলেন।

কিন্তু মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠা ও একটি মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলার পথে প্রধান বাধা ছিল উদারনৈতিক নারোদবাদ। পিটার্সবুর্গে কমরেড লেনিন উদারনৈতিক নারোদবাদীদের সাথে মতাদর্শ লড়াই চালিয়ে গেছেন। নারোদবাদীরা তাদের পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় মার্কসবাদীদের ওপর আক্রমণ চালাত এবং নিজেদের জনগণের বন্ধু বলে প্রচার করতো। ১৮৯৪ সালে লেনিন এদের মতের বিরোধিতা করে "জনগণের বন্ধু কারা এবং কিভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে লড়েন" নামে পুস্তকে তিনি নারোদবাদীদের তাত্ত্বিক মতবাদের কঠোর সমালোচনা করে তাদের ভ্রান্তি ও অনিষ্টকারক ভূমিকা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। লেনিন বলেন যে, নারোদাবাদ বিপ্লবী মতবাদ থেকে পরিণত হয়েছে উদারনৈতিকতায়, এখন তারা ছোটখাট সংস্কারের কথা বলছে এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামকে একেবারে পরিত্যাগ করেছে। তিনি এদের শ্রেণীচরিত্র উন্মোচন করে বলেন তারা জনগণের কপট বন্ধু, আসলে কুলাকদের প্রকৃত বন্ধু।

এই প্রসঙ্গে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের মৈত্রীর মহান ধারণাটিকে বিকশিত করেন। এছাড়া তিনি দেখান যে স্বৈরাচার, জমিদার-বুর্জোয়া শাসনকে উচ্ছেদ না করে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই মূল্যবান ধারণাটি তিনি বিকশিত ও প্রতিষ্ঠা করতে সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। পিটার্সবুর্গে লেনিনের লড়াই এবং তাঁর তাত্ত্বিক রচনার মাধ্যমে মার্কসবাদের বিকাশেও রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন লেনিনীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে।

কমরেড লেনিনের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য জারের সরকার তাঁকে প্রাচ্য সাইবেরিয়ায় তিন বছরের জন্য নির্বাসিত করে। এই জায়গাটা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। আত্মীয়স্বজন ও কমরেডদের সহযোগিতায় তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য ও অন্যান্য পুস্তক পেতেন এবং অধ্যয়ন করতেন। এখানে বসে তিনি বিদেশী পুস্তক রুশ ভাষায় অনুবাদ করতেন। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকাকালীন তিনি রচনা করেন 'পার্টির খসড়া কর্মসূচী'।

৩০টির বেশি প্রবন্ধ-নিবন্ধ তিনি এখানে রচনা করেন। এর মধ্যে রুশ 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কর্তব্য' শীর্ষক পুস্তিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কর্তব্য নির্দেশ করেন ও সংহত শ্রমিক পার্টি গঠনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন এবং মার্কসবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

নির্বাসনে থাকাকালীন লেনিন 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' বইটি রচনা সম্পন্ন করেন। ১৮৯৯ সালে তা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা যা সরাসরি মার্কসের পুঁজি গ্রন্থটির পূর্বানুসরণ। রাশিয়ার অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে লেনিন নতুন আঙ্গিকে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন। প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দেখান যে রাশিয়ার পুঁজিবাদ শুধু শিল্পে নয় কৃষিতেও জোরদার হচ্ছে। এই পুস্তকের মাধ্যমে নারোদবাদের তিনি পূর্ণ সমাধি ঘটান।

নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হয় ১৯০০ সালের ২১ জানুয়ারি। ঐদিন সকালে তিনি সস্ত্রীক শুশেনস্কয় ছাড়লেন। প্রায় ৩২০ কিলোমিটার রাস্তা ঘোড়ায় চড়ে অতিক্রম করে দেশের রাজধানী ও শিল্পক্ষেত্র পিটার্সবুর্গে পৌঁছোলেন। এইখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পিটার্সবুর্গে লেনিনের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

(২)

মার্কসীয় মতবাদকে ভিত্তি করে তাকে পরিস্থিতির উপযুক্ত করে লেনিন তাঁর মতবাদকে নির্মাণ করেছিলেন। এই জন্য মার্কসবাদের সাথে লেনিনবাদ একই সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। কিন্তু তিনটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯০২ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'কি করিতে হইবে'। এই পুস্তকে তিনি সর্বহারার পার্টি গঠনের পরিকল্পনা বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করেন। লেনিনের মতে এই পার্টিকে হতে হবে আগাগোড়া বিপ্লবী নতুন ধরনের সংগ্রামের পার্টি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাশিয়ায় প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের অনেক পূর্ব থেকেই পশ্চিম ইউরোপে শ্রমিক পার্টিগুলি বর্তমান ছিল। লেনিনর মতে এদের সাথে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তফাৎ ছিল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি গড়ে উঠেছিল অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের পরিস্থিতিতে। বিপ্লবী সংগ্রামের যোগ্যতা সেইভাবে তাদের ছিল না। সুবিধাবাদীদের সাথে যার আপোষ করতো তারা ক্রমশ এইসব পার্টির মধ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। সুবিধাবাদীরা মনে করতো এবং তারা বোঝাতো প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়াই শোষণের অবসান এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। এর মধ্যে দিয়ে তারা শ্রমিক শ্রেণীকে কার্যত নিষ্ক্রীয়তার জায়গায় ঠেলে দিত এবং নিজেরা হয়ে পড়ত কার্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক। মার্কসবাদের পুনর্বিচার, সংশোধন করে মার্কসবাদের বিপ্লবী সারটুকু পরিত্যাগ করতো তারা। এরা ছিল আপোষকামী, বুর্জোয়াদের সাহায্যকারী ও তাদের দালালদের ভূমিকা পালন করতো। অধিকাংশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্ব সুবিধাবাদীদের নিন্দা করতো কেবল কথায় কিন্তু কাজে তাদের সাথে মানিয়ে চলতো।

কমরেড লেনিন মনে করতেন শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হলে তার পরিচালক শক্তিকে অবশ্যই অগ্রণী বিপ্লবী তত্ত্বে সমৃদ্ধ হতে হবে। মার্কসবাদে সশস্ত্র হতে হবে। এই তত্ত্বকে তারাই বহন করে আনে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এবং এর দ্বারাই শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সমাজতন্ত্রের চেতনাকে প্রোথিত করে। লেনিন মনে করতেন, "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়"। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে সর্বহারার পার্টির মূল নীতিগুলি তিনি পেশ করেন। পার্টি গঠনের প্রশ্নে পার্টি পত্রিকা প্রকাশের ওপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারণের প্রসঙ্গটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ লেনিনীয় অবদান বলে মনে করা হয়। মার্কস বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হিসেবে বুর্জোয়াদেরই ভেবেছিলেন, কারণ সেই সময়ে বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। লেনিন ও বলশেভিকরা রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিপ্লবের এই স্তরে কর্তব্য হলো ভূমিদাস প্রথার অবশেষের বিলোপ, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ। লেনিনের কৃতিত্ব এই যে, মার্কসবাদের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, তার চালিকাশক্তি ও পরিপ্রেক্ষিতের প্রশ্নটি বিচার করেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ হলো বুর্জোয়া বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিজয়, কারণ এর মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের জন্য তার সংগ্রাম নিকটবর্তী ও সহজলভ্য হবে।

তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি হতে হবে শ্রমিক শ্রেণীকেই। শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী হলো কৃষক সম্প্রদায়, যাদের স্বার্থ ছিল জমিদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেওয়া ও জারতন্ত্রের ধ্বংস সাধন। এইভাবে বিপ্লবের প্রসার নির্ভর করেছিল তার মূল চালিকাশক্তি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের ভূমিকার ওপর। অপরদিকে বুর্জোয়ারা ছিল জারতন্ত্র সংরক্ষণের পক্ষে। তাদের শ্রেণী চরিত্রই ছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে। বলশেভিকরা স্থির করেন জনগণ থেকে বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন এবং একঘরে করতে হবে, খুলে দিতে হবে তাদের গণতান্ত্রিকতার মুখোশ।

১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব তার চালিকা শক্তির দিক থেকে ছিল জনবিপ্লব। এখানে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও সশস্ত্র সংগ্রামের মতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল। লেনিন রচিত বলশেভিক রণকৌশল ছিল বিপ্লবের লক্ষ্যে চালিত। কিভাবে তা অর্জন করা যাবে তার ব্যাখ্যা এখানে ছিল। এটি ছিল সত্যিকারের বিপ্লবী রণকৌশল। এই জন্য এই স্তরের বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে লেনিন বিশেষিত করেছেন। 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির দুই রণকৌশল' পুস্তকে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী ধারণাকে এমন সব নতুন ও কার্যকরী ভাবনা দিয়ে সমৃদ্ধ করেন যা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সংগ্রামে বিশ্বের সব অংশের জনগণের কাছেই ছিল দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ। এইভাবে তিনি মার্কসবাদকে বিকশিত করেন।

তৃতীয়ত, বিপ্লবের ধারাবাহিক নেতৃত্বদানের সাথে সাথে লেনিন কঠোর তাত্ত্বিক কাজও চালিয়ে যান। বিভিন্ন দেশের সামাজিক জীবনের ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্য তিনি অক্লান্ত ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। দর্শন, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সম্পর্কে অধ্যয়নের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলন, পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশের নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে রচিত পুস্তক সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিশেষ, গভীর অধ্যাবসায়ের সঙ্গে তিনি পড়েন সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়।

মানব সমাজ বিংশ শতাব্দীতে নতুন যে যুগে প্রবেশ করেছে তার মূল চরিত্র মার্কসবাদীদের মধ্যে লেনিনই প্রথম উদ্ঘাটিত করেন। 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থে লেনিন দেখালেন যে বিশ শতকের শুরুর সময় থেকে পুঁজিবাদ তার বিকাশের নতুন এক পর্ব সাম্রাজ্যবাদে প্রবেশ করেছে। এই পর্বে ৫টি বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেন। এর মধ্যে ছিল—(১) বিশ্বের কাঁচামালের উৎস, (২) পণ্য উৎপাদন ও বাজারের একটা অংশ দখল করে নেওয়া, (৩) একচেটিয়া মালিকদের দ্বারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে আধিপত্য বিস্তার করা, (৪) সরকারগুলির ওপর তাদের নিজেদের অভিপ্রায় চাপিয়ে দেওয়া, (৫) মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশের নিজেদের মধ্যে সারা পৃথিবীকে ভাগবাঁটোয়ারা করেন নেওয়া। এসবের ফলে বৃদ্ধি পায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য। তিনি দেখান যে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে পুঁজিবাদের পথ নিয়েছে এমন দেশ—জার্মানি, জাপান ও আমেরিকা, অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে ধরে ফেলে ও বিশ্বের পূণর্বণ্টন দাবি করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ প্রবলভাবে দেখা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। মার্কসবাদের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই লেনিনীয় ধারণা।

(৩)

বর্তমান সময়ে মার্কসবাদ লেনিনবাদকে তত্ত্বগতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। জন্মলগ্ন থেকে এই আক্রমণ শুরু হলেও গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিশেষত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিদায়ের পর আক্রমণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে।

প্রথমত, মার্কসবাদ থেকে লেনিনবাদকে আলাদা করার অপপ্রয়াস চলছে। অর্থাৎ, বলার চেষ্টা করা হচ্ছে কার্ল মার্কস পর্যন্ত ঠিক আছেন কিন্তু লেনিনকে তাদের গ্রহণ করতে মহা আপত্তি। তাদের কাছে লেনিনের মহা অপরাধ তিনি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, এক অংশ মনে করেন যে, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা মার্কসবাদ বিরোধী কাজ, কারণ মার্কস বলেছিলেন, শ্রমিক বিপ্লব উন্নত পুঁজিবাদ দেশেই প্রথমে সংগঠিত হবে। কিন্তু লেনিন একে অমান্য করে রাশিয়ার মতো অনুন্নত দেশে বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। তাদের চোখে এটি একটি বিচ্যুতি।

কিন্তু বিপ্লবী পার্টি গঠন এবং সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব সম্বন্ধে লেনিনীয় আলোচনা বর্তমান সময়ে দারুণ প্রাসঙ্গিক। কমরেড লেনিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির মূল নীতি সম্পর্কিত আলোচনায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রশ্নটিকে সামনে এনেছিলেন। এর প্রধান ভিত্তি ছিল আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, কঠোর শৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রীয় লাইনের দ্বারা পার্টিকে পরিচালনা করা। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে যে ধরনের চরম দক্ষিণপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনকে যদি এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে ঢিলেঢালা সংগঠনের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়, তাই সংগঠনের সর্বস্তরের কঠোর শৃঙ্খলা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনীয় ধারণা সেকেলে হয়ে গেছে বলে সমালোচকদের পক্ষ থেকে যা বলা হচ্ছে, তাও সঠিক নয়। বর্তমানে লগ্নিপুঁজি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এবং তা ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। এই পুঁজি উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করে বিশ্বব্যাপী তার আধিপত্য কায়েম করতে চলেছে। বর্তমান শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ কতখানি আক্রমণাত্মক হচ্ছে তা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশ উপলব্ধি করছে। শুধু তাই নয়, মতাদর্শগত স্তরে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বৌদ্ধিক এবং মনোজগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে। এসবের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিপদ আদৌ হ্রাস পায়নি বা সেকেলে হয়ে যায়নি। এসবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে লেনিনের প্রাসঙ্গিকতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পরিশেষে মার্কসবাদ সম্পর্কে কমরেড লেনিনের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি স্মরণে রেখে বর্তমান সময়ে তাঁর নির্দেশিত কাজগুলি আমাদের করতে হবে। তিনি লিখেছেন, "মার্কসের তত্ত্বকে কখনও এইভাবে দেখা উচিৎ হবে না যে তা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। বরং বিপরীতক্রমে আমাদের দৃঢ়তার সাথে মনে রাখতে হবে যে মার্কসের তত্ত্ব নেহাৎই বিজ্ঞানের একটি ভিত্তিপ্রস্তর, সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য হলো সেই তত্ত্বকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর করে নিয়ে চলা যদি তারা জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে চান।"

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মানুষের পাশে, মানুষের সাথে

বিজয় শংকর সিংহ

বিশ্বজুড়ে মহামারী আকারে করোনা ভাইরাস (Covid-19) সংক্রমণের ফলে আতঙ্কের কোনো শেষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যতদিন যাচ্ছে আরো সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সারা বিশ্বে ও আমাদের দেশে মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে এবং আরো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। সারা বিশ্বের মানব সমাজ আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যে সব দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত ও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা, মানুষের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে উপযুক্ত নজরদারি বা সার্বিক প্রচার ও সর্বোপরি চিকিৎসায় সর্বশক্তি যারা প্রয়োগ করতে পেরেছে তাদের সাফল্য এসেছে এবং বিশ্ব-মহামারীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক বেশি সাফল্য পেয়েছে। বিশ্বে এইসব দেশের সংখ্যা নগণ্য হলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে কোনো ঔষধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার এখনও হয়নি, বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এ কাজে নিয়োজিত থেকে সব দিক থেকে চেষ্টা করছেন, এখনও কোনো সুরাহা করতে পারেনি।

একদিন অবশ্যই বিজ্ঞানী ও গবেষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় টীকা, ভ্যাকসিন বা ঔষধ আবিষ্কার হবে এবং অতীতের এরকম অনেক মহামারীর ন্যায় নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে এই মহামারী ভাইরাসকে।

এই পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বজুড়েই যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে তাতে সারা বিশ্বের দেশগুলিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মানুষের পাশে সার্বিকভাবে দাঁড়ানোই হলো আশু জরুরি ও প্রধান কাজ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই সময়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই জরুরি আর করণীয় কর্তব্য ঘোষণা করেছে।

সারা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী দেশগুলিই দেখা যাচ্ছে ব্যর্থ হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বা অন্যান্য দেশ যারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশমতো ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তারা অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে।

আমাদের দেশের আর এস এস-বিজেপি সরকার প্রথম থেকে গুরুত্ব দেয়নি এবং প্রস্তুতি ছাড়াই লকডাউন ঘোষণা করে সাধারণ প্রান্তিক ও গরিব মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্মম অসহায় অবস্থার কথা সারা বিশ্ব জেনে ফেলেছে। নোট বাতিল, জিএসটি'র পর লকডাউনের ধাক্কায় মানুষ দিশেহারা। একমাত্র দেশের বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এই চরম গাফিলতি ও স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

এইরকম এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যক্কারজনকভাবে অভিযান চালাচ্ছে আর্থিক আক্রমণে, প্রতিবাদ দমনের জন্য, অধিকার হরণ করতে, স্বৈরাচারী পদক্ষেপ আরো দৃঢ়তার সাথে নামিয়ে আনতে, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ও রেলকে বেসরকারীকরণ করতে, সর্বোপরি দেশের সার্বিক স্বার্থকে আরো পিষ্ট করতে। আর যখন সারা বিশ্বে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে তখন প্রতিদিন দর বৃদ্ধি করে দু'লক্ষ কোটি টাকার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে মানুষের উপর। করোনা ভাইরাস যেন মোদি সরকারের কাছে আরো আর্থিক ও রাজনৈতিক আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে। এ এক ভয়ঙ্কর চেহারা নিচ্ছে।

এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার করোনা মহামারী ঠেকাতে ব্যর্থ। দারুণ অসহায় আক্রান্ত মানুষ। এছাড়া করোনা ভাইরাস ও আমফান ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে থাকার পরিবর্তে সর্বত্র লুঠের রাজ চালাচ্ছে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। যারা সারদা, নারদাসহ অসংখ্য কেলেঙ্কারিতে যুক্ত, তারা নেতা-মন্ত্রী হয়ে বসে আছে। তারা নাকি ধরবে চোর। এ এক নোংরামোর চূড়ান্ত চলছে। একমাত্র বামপন্থীদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারা রাজ্যজুড়ে সোচ্চার হচ্ছে।

যে কোনো বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের রাজ্যে স্বাধীনতা উত্তরপর্বে এমন ভূমিকার বহু ইতিহাস রয়েছে। আর এই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই রাজ্যের সরকারী সমাজ ও তাদের নেতৃত্বদায়ী বৃহত্তম সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কোভিড-১৯ বিপর্যয়ে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে প্রশাসনিক ও সামাজিকভাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীকে ২০ মার্চ, ২০২০ চিঠি দিয়েছি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই ভূমিকা শুধুমাত্র যে রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। অতীতে খরা, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রকৃতির রোষে যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে, রাজ্য সরকারী কর্মচারী বন্ধুদের সাহায্যে ত্রাণ তহবিল গড়ে তুলে, সেই তহবিলের অর্থে প্রয়োজনীয়

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামের লকডাউন—বিকল্পের সন্ধানে

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের চেনা ছকের দুনিয়াটাকে বদলে দিয়েছে কোভিড-১৯ অতিমারি। পৃথিবীজুড়ে মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যাতে অতিমারির সংক্রমণে লাগাম পরানো যায়। অথচ পুঁজিবাদ ও তাদের পরিচালনাধীন দেশগুলি ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না গড়ে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোভিড-১৯ অতিমারির সাফল্য সমগ্র বিশ্বের নজর কেড়েছে। মহামারিজনিত বিপর্যয়ের মুখে অনেক পুঁজিবাদী দেশে কল্যাণকর রাষ্ট্রের কথাও উচ্চারিত হচ্ছে। অতিমারির প্রতিকূল প্রভাব পৃথিবীর সমস্ত দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনে পড়েছে। বেকারত্বের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান বিঘ্নিত—দুনিয়ার ওপর আর্থিক মন্দার কালো মেঘ যেন ঘনিয়ে আসছে, এই অবস্থায় হতাশা স্বাভাবিক। আবার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় এই বিপন্ন সময়টি ভেবে দেখার অবকাশও দিয়েছে আমাদের—নিজেদের জীবনযাত্রার ধারণাটাকে বিচার করে দেখার অবকাশ। সবকিছুর একটা ইন্টারেস্টিং প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে যখন ভাইরাসের কারণে লকডাউন হয়েছে এবং অর্থনীতি ধ্বসে পড়েছে। দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে না পারার ফলে আমাদের হাতে অঢেল সময় রয়ে যাচ্ছে। আসলে এর পেছনের কারণটি হলো বেকারত্ব। খোদ আমেরিকায় দু'কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এটা অবশ্যই বিপর্যয়। কাজ হারানোর ফলে ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুণ পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থনীতি ধাক্কা খায়।

ভারতে এই সঙ্কট বিশেষ মাত্রা পেয়েছে শুধুমাত্র পরিকল্পনাহীন লকডাউন এবং সরকারী চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে তা নয়, আমরা সাক্ষী থাকছি এক অভূতপূর্ব মানবিক সঙ্কটের। ভিন্ রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক, কোটি কোটি স্বনিযুক্ত মানুষ এক অভূতপূর্ব আর্থিক সঙ্কটের শিকার হয়েছেন। এই সময়কালে দেশে ১৫ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। ভারতে ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতার সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে লকডাউনের প্রভাব ব্যাপক। মৃত্যুমিছিল বেড়েই চলেছে। তথ্যের কারচুপি সত্ত্বেও রোগের সংক্রমণে কতজনের মৃত্যু ঘটেছে তার তথ্য প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ক্ষুধার বা দারিদ্র্যের ছোবলে দেশের প্রান্তিকস্তরের মানুষগুলিকে কী মূল্য দিতে হচ্ছে তার কোনো পাকা হিসেব এখনও পর্যন্ত জনসমক্ষে আসেনি। আদৌ আসবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। আমাদের দেশের শ্রমিকদের সাথে বিশেষ করে দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিক, মহিলা শ্রমিকদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তা অতি দুর্ভাগ্যজনক তাঁরা সুতীব্র দারিদ্র্যের জ্বালায় বাড়ি ছেড়ে, পরিবার-পরিজন ছেড়ে বহু দূরের

কোনো রাজ্যে কাজের খোঁজে গিয়েছিলেন। শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের সংস্থান করতে যে মানুষকে এতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সেটাই অতি দুঃখের, অতি লজ্জার। হঠাৎ করে লকডাউন ঘোষণা করার ফলে তারা বিপন্নতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছোলেন। রাতারাতি কাজ হারালেন। কয়েকশো কিলোমিটার হেঁটে বাড়িতে ফেরার চেষ্টায় রাস্তাতেই প্রাণ হারালেন বহু মানুষ। এই ঘটনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে থেকে যাবে। অথচ ভারতীয় সংবিধানে এই শ্রমিকদের ব্যাপারে ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা অর্পিত আছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে। সংবিধানের ২৪৬ নং ধারার সাথে সপ্তম অনুসূচির প্রথম তালিকায় ৮১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে 'ইন্টার স্টেট মাইগ্রেশন' বা আন্তঃরাজ্য অভিবাসন এবং 'কোয়ারান্টিন'—এই দুটি বিষয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণত কেন্দ্রীয় সরকারের। ১৯৭৯ সালে মোরারজি দেশাইয়ের মন্ত্রিসভা একটি আইন বলবৎ করেছিল যার নাম আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমজীবী আইন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিশ্চয় কাজ নয়, সেই সংবিধান বর্ণিত দায়িত্ব থেকে বিস্মৃত হয়ে নীরব দর্শক থেকে সাধারণ মানুষকে শুধু থালা, ঘণ্টা বাজাতে বলা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সুদক্ষভাবে সাংবিধানিক কর্তব্যকে অস্বীকার করলো। ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক দুরবস্থার শিকার পরিযায়ী শ্রমিকরা। অনেক সংগ্রামের পর এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু এক্ষেত্রেও চরম অব্যবস্থা ও অমানবিকতার শিকার হয়েছে তারা। কমপক্ষে ১০ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েছেন। অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তিকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করতে এবং আয়করের সীমার বাইরে প্রতি পরিবারকে মাসিক ৭৫০০ টাকা করে দিতে। পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারগুলিকেও কয়েক মাসের জন্য এই সাহায্য দিতে, যাতে তারা অতিমারির সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারে। পরিবর্তে সরকার দিয়েছে এক বড় ধরনের ভাঁওতা। পুঁজিপতিদের স্বার্থে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা আসলে 'আত্মনির্ভরতার' নামে দেশকে আরও পরনির্ভর করা।

করোনা অতিমারিজনিত পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের মরিয়া চেষ্টার আসল লক্ষ্য করোনা মোকাবিলা নয়, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশি-বিদেশী পুঁজির প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করা। মুনাফা বজায় রাখতে তারা মানবজীবনকে ব্যবসায়িক বিনিময়ের মাধ্যম বানাতে বা জাতীয় সম্পত্তি নয়ছয় করতেও দ্বিধা করে না। এই উদ্দেশ্য সফল করতে প্রশাসনিক নিয়মাবলীকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেওয়ার প্রক্রিয়াও জারি রাখে। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা আইনের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের দায়বদ্ধতা অগ্রাহ্য করে, দমন করে নাগরিক স্বাধীনতা। আপতকালীন এই বিশেষ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে শাসকশ্রেণী এবং তাদের পরিচালিত সরকার মুনাফা সুসংহত করতে চাইছে। এটা বোঝা দরকার যে মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে একতরফা লকডাউন চাপানো কোনো প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়। প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে জনগণকে অসহায়ত্বের বাধ্যতায় নিক্ষেপ করা। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিরোধী মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা এবং শ্রম আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার সঙ্কুচিত করার মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা। এক কথায় আর এস এস-বিজেপি'র রাজনৈতিক অভিসন্ধি হলো করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির পটভূমিতে অতিমারি পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ভারত ভাবনার মৌলিক ভিত্তি ভারতের সংবিধান। এই সংবিধান বৈচিত্র্য বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রের ধারাকে প্রসারিত করে যা আর এস এস-র চক্ষুশূল। কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা থেকে তারা মানুষের ওপর আনুগত্যের অনুশোচনা চাপিয়ে দেয়। অনেকটা স্বৈরাচারী কায়দায় মানুষের মনোজগতে দাসত্বের বেড়ি পড়িয়ে দিতে চায়। অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে উদ্ভূত যুক্তির সাহায্যে মানুষের সামনে তুলে ধরে মনোজগৎকে প্রভাবিত করার যে মনস্তাত্ত্বিক পথ আর এস এস-বিজেপি ব্যবহার করে সেই 'সামাজিক প্রযুক্তি'র পথ ধরেই লকডাউনের সময়ে সামাজিক বিভাজনের কাজটিকে জোরালোভাবে চালায়।

রাজ্যের অবস্থাও তথৈবচ। করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা প্রকট হয়েছে।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চম পাতার পরে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মানুষের পাশে, মানুষের সাথে

সামগ্রী ক্রয় করে দ্রুত মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কাশ্মীর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র—এমন অসংখ্য ভূমিকার মাইল ফলক গাথা রয়েছে সংগঠনের চলার পথে। এমনকি এ রাজ্যে জেলায় জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন বিদ্যালয় ভবনের পুনর্নির্মাণের কাজও করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এমনকি কিউবা ও প্যালেস্তাইনের মুক্তিকামি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সংগঠনের আহ্বানে আমাদের রাজ্যের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ।

স্বভাবতই করোনা সংক্রমণ ও লকডাউনজনিত দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়া গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত অতীত ঐতিহ্য অনুসারী। বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মতোই, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও সাংগঠনিক শক্তিকে সংহত করে, সংগঠনের ব্লক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠামোকে ব্যবহার করে, অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলির ও রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতাকে যুক্ত করে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গড়ে তোলা হয় করোনা ত্রাণ তহবিল। লকডাউনের কারণে সমস্ত রাজ্য সরকারী দপ্তর বন্ধ থাকা অবস্থায়, পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের কোনো সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় সংগঠনের আহ্বান প্রচারিত হতেই ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় কর্মচারী বন্ধুদের কাছ থেকে। স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে বিভিন্ন উপায়ে, হয় নিকটবর্তী কর্মী সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ করে, অথবা 'অনলাইন' ট্রান্সফারের মাধ্যমে তারা অনুদান পাঠিয়ে দিতে থাকেন সংগঠনের করোনা ত্রাণ তহবিলে।

করোনা ও লকডাউন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যায় রাজ্য কর্মচারীরাও জর্জরিত। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির বাজারে মহার্ঘভাতাবিহীন বেতন পাওয়ার ফলে, প্রতি মাসেই কার্যত পাহাড়প্রমাণ বেতনের ক্ষয় ঘটছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সংগঠনের আহ্বানে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন কর্মচারীরা ও রাজ্যের অবসরপ্রাপ্তরা, তাতে প্রমাণিত হয় বাহ্যিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতি সিংহভাগ কর্মচারীর আস্থা অটুট রয়েছে। এ রাজ্যের প্রশাসনের অভ্যন্তরে দ্রুত প্রজন্মান্তর ঘটে চলেছে। কিন্তু একটি বার্তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান—কর্মচারী স্বার্থ রক্ষার্থে ভূমিকা পালন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালন, উভয়বিধ ক্ষেত্রেই রাজ্য প্রশাসনের কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র চ্যাম্পিয়ন সংগঠন হলো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সংগঠনকে যেমন কর্মচারীরা ভালোবাসেন, তেমনই কর্মচারীদের প্রতি সংগঠনের দায়বদ্ধতা অপরিসীম। তাই করোনা সংক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংগঠন সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি নজর দেয় তা হলো, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্সিং স্টাফসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি। একাধিকবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্যসচিব, ও সমস্ত জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে পত্র মারফৎ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ৮ জুন থেকে সরকারী দপ্তর খোলার সিদ্ধান্ত যখন রাজ্য সরকার ঘোষণা করে, তখনও কমর্কচারীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে করোনা মহামারী মোকাবিলায় ১২ জন আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ প্রদানে মৃত কর্মচারীদের পরিবারগুলির পাশে থাকার পাশাপাশি ইতিমধ্যে প্রায় ১২০০ স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য কর্মচারীরা যাঁরা আক্রান্ত হয়ে লড়াই করছেন, তাদের আর্থিক সাহায্যসহ উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছি।

পাশাপাশি চালু করা হয় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজ। এপ্রিল, মে, জুন মাস ব্যাপী রাজ্যের সমস্ত জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এ পর্যন্ত ১৬,১০৫টি পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে খাদ্য সামগ্রী, সাবান, স্যানিটাইজার, মাস্ক ও মশারি। এছাড়াও কলকাতার ১৩০০ দুঃস্থ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ত্রাণ। সংগঠনের দার্জিলিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর দিনাজপুর ও বর্ধমান জেলা কমিউনিটি কিচেন তৈরি করে রান্না করা খাবার খাইয়েছে ১২৯৬০ জন প্রান্তিক ক্ষুধার্ত মানুষকে। বীরভূম ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি প্রসূতি মায়েদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে বিশেষ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সামগ্রী।

ত্রাণের কাজের পাশাপাশি এই সময়কালেই সংগঠন দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। একটি হলো বিশেষ রক্তদাতার তালিকা তৈরি করে চাহিদা মাফিক রক্তদাতা প্রেরণ। এইভাবে ৬২ জন কর্মী-সংগঠক মুমূর্ষুদের জন্য রক্ত দিয়েছেন। এছাড়াও ১২ জুলাই কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে রক্তদান কর্মসূচী। এই কর্মসূচীতে ৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন। অনুরূপভাবে জেলাগুলিতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হলো রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সংগঠনের এই প্রচেষ্টাকে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা প্রশংসা করেছেন। লকডাউন চলাকালীনই আমফানের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয় রাজ্যের একাংশ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কয়েকটি ব্লকে পৌঁছে দেওয়া হয় ত্রাণ সামগ্রী। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই বিশেষ কর্মসূচী ধারাবাহিকভাবে চালু থাকবে, এমনই সিদ্ধান্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া ত্রাণের কাজে এ রাজ্যের নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ, বিশেষত বামপন্থী সংগঠনগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা বহু মানুষের মুখে সাময়িকভাবে হলেও হাসি ফোটাতে পেরেছে। কিন্তু নাগরিক সমাজের উদ্যোগ যতই ঐকান্তিক হোক না কেন, তার একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের ব্যর্থতার ফলে যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসন অর্থাৎ দুটি সরকারই যাতে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে তার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কাজটাও নাগরিক সমাজের দায়িত্ব। সমাজের অংশ হিসাবে রাজ্য কর্মচারীরাও এই দায়িত্ব পালনে সঙ্কল্পবদ্ধ। □

পঞ্চম পাতার পরে

সংগ্রামের লকডাউন—বিকল্পের সন্ধানে

দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যাকে চেপে দিয়েও চিকিৎসা পরিকাঠামোর ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখা যায়নি। অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন আত্মপ্রচারে ব্যস্ত থেকেছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে গরিব কাজ হারা মানুষের মধ্যে ত্রাণ ও সাহায্যের কাজে শাসকদলের পক্ষ থেকে বারে বারে বাধা তৈরি করা হয়েছে। করোনার পাশাপাশি আমফান বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি শাসকদলের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের সামনে উদঘাটিত হয়েছে। বামপন্থী সংগঠনগুলি যখন আক্রান্ত মানুষের পাশে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে তখন দেশ ও রাজ্যের শাসকদল ব্যস্ত থেকেছে আত্মপ্রচার এবং সংঘাতের মেকি মমফাইট করে প্রচারের আলোয় থাকতে। তবে কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারের আলোয় স্থান না পেলেও মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে বামপন্থীদের এই ধরনের সামাজিক কাজ।

অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলির ন্যায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও লকডাউন জারি হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত স্থানে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সর্বস্তরের কর্মচারী-সদস্যদের আর্থিক সাহায্যের সমন্বয়ে গঠিত ত্রাণ তহবিল থেকে খাদ্য সামগ্রী এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে রাজ্যের প্রত্যন্ত মানুষগুলির কাছে। অনেকক্ষেত্রে ত্রাণ পৌঁছানো বা অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মচারী বিপুল উৎসাহ নিয়ে কাজে যুক্ত হয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে এই কাজের মাধ্যমে সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত আমাদের গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ ঘটানো গেছে। এই সময়কালে এক নতুন অভিজ্ঞতায় আমরা সমৃদ্ধ হলাম। করোনা অতিমারি প্রতিরোধে 'সামাজিক দূরত্ব' বজায় রাখার ঘৃণ্য কৌশলকে ছিন্ন করে সৃজনশীলতার ও উদ্ভাবনার যে নতুন নিদর্শন কর্মচারী সমাজ উপস্থিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। আবার একথাও ঠিক যে নেতৃত্ব-কর্মীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ এই সময়কালে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। অতিমারিজনিত ভয়-ভীতিও গ্রাস করেছে একাংশকে। সাবধানতা অবলম্বনে সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলা প্রয়োজন, কিন্তু অযথা ভয়-ভীতি সংগ্রাম বিমুখতার জন্ম দেয়। তা কাটাতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে দৈনন্দিন সাংগঠনিক কাজে যুক্ত করা প্রয়োজন। কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সঙ্কট যত বৃদ্ধি পাবে, ততই বাড়তে থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আক্রমণ। শাসকশ্রেণীর নামিয়ে আনা হামলার বিরুদ্ধে বৃহত্তর লড়াই-আন্দোলন সংগঠিত করার প্রস্তুতি নেওয়াটাই আগামীদিনের কাজ। সঙ্কট যত গভীর হবে, হামলার ধরনও হবে নিষ্ঠুর, বর্বর। তাই লড়াই-আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে চাই ব্যাপকতম ঐক্য। সচেতনতা, চাই নিজের সাথে নিজের নিরন্তর সংগ্রাম। দীর্ঘ লড়াই-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা অর্জন করেছিল। বর্তমানে রাজ্যের শাসকদলের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীগত কারণে তা আক্রান্ত। অধিকার পুনরায় অর্জনে আইনি লড়াইকে একমাত্র পথ হিসেবে ভাবছেন। স্যাটের ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ঠিকই, তবে তা কার্যকরী করতে চাই শাসক দলের সদর্থক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী, যা এই সরকারের আমলে পরিলক্ষিত হয়নি। তাই এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত রাখতে লড়াই ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। রাস্তায় নেমে যে অধিকার অর্জন করা হয়েছিল তা সুরক্ষিত রাখতে রাস্তাই একমাত্র পথ।

সময়টা হতাশাব্যঞ্জক। অথচ এটা এমন সময় যখন আমাদের উচিৎ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামা। বিপর্যয় থেকেও ফিরে আসা যায়---এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সময় এসেছে এখন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কার্ল মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তি "আমরা পছন্দমত পরিস্থিতিতে ইতিহাস তৈরি করি না। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে কী করে আমরা পরিস্থিতির সুযোগকে সব থেকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি।" মুক্তির পথে সন্ধান পেতে সর্বাগ্রে আমাদের সমস্ত মূঢ়তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে, যাতে আমরা নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আলোর পথ দেখাতে পারি। □

তৃতীয় পাতার পরে

রেল ও কয়লা ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ

কোনো বাধাই না থাকায় স্বাভাবিক কর্পোরেটদের উল্লাস।

'আত্মনির্ভরতা'র নামে মোদী সীতারমনরা লকডাউনের মধ্যেই তুলে দিয়েছেন কয়লা ক্ষেত্রকে পুরোপুরি বেসরকারী হাতে। ৪১টি ব্লকের নিলাম ১৮ জুন শুরু হলেও সম্ভাব্য কর্পোরেটদের সঙ্গে বৈঠক করাও শুরু করে দিয়েছে মোদী সরকার। 'ইকনমিক টাইমস' পত্রিকার সূত্র অনুযায়ী, হিন্ডালকো, জেএসডব্লিউ এনার্জি, জিন্দাল স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার, আদানি বেদান্তর মতো গ্রুপ সম্ভাব্য উৎসাহী। দুনিয়ার তাবড় খনি সংস্থা যেমন পিবডি, বিএইচপি বিলিটন, রিও টিন্টো ইতিমধ্যেই উৎসাহ প্রকাশ করেছে নিলামে কয়লা ব্লক কিনতে!

কোনোভাবেই কয়লা ব্লককে দেশি-বিদেশী মুনাফার হাতে তুলে দিতে নারাজ শ্রমিকরা। ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে খাদানে খাদানে।

১০ জুন কয়লা শিল্পের প্রতিটি ফেডারেশন একত্রে দেশের কয়লা নিবিড় ৮টি রাজ্যের ৫৩৫টি কোলিয়ারিতে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে শামিল হয়েছেন। ১৮ জুন চলেছে সমস্ত কোলিয়ারিতে ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া।

২ জুলাই থেকে ৪ জুলাই টানা তিনদিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন কয়লা ক্ষেত্রের ১০০ শতাংশ শ্রমিক কর্মচারীরা, শামিল আধিকারিকরাও।

ইতিমধ্যেই প্রতিরোধের সম্মুখীন মোদী সরকার। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী জেএমএম নেতা হেমন্ত সোরেন কয়লা ব্লক নিলামের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন সুপ্রিম কোর্টে। ছত্তিশগড়ের হাসদেও বনাঞ্চলের ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চিঠি লিখেছেন মোদীকে, নিলাম করা যাবে না হাসদেও ব্লক। ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারও নারাজ নিলামে। প্রতিবাদ জানিয়েছে মহারাষ্ট্রের সরকারও।

২ জুলাই থেকে ৪ জুলাইয়ের ধর্মঘট এ রাজ্যেও হয়েছে সর্বাত্মক। তার আগে রাজ্যের ৭৬টি কোলিয়ারিতে নিবিড় প্রচার করা হয়। বর্তমান শাসকদলের পক্ষ থেকে ধর্মঘট বানচাল করার চেষ্টা হলেও শ্রমিকদের প্রতিরোধে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে তারা। ৭৬টি কোলিয়ারির ৫৮ হাজার শ্রমিক অংশ নিয়েছেন ধর্মঘটে।

প্রতিরোধ, উল্টোদিকে অবাধ্যতা। মোদী সরকার নিয়ম বদলাতে পারে, নিলামে চড়াতে পারে জাতীয় সম্পদ। পাল্টা প্রতিরোধে ধর্মঘটে জাতীয় সম্পদ বিক্রি রুখবেন শ্রমিকরা, খাদানে খাদানে ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন শ্রমিকরা। □

তৃতীয় পাতার পরে

করোনা মোকাবিলা, অন্ধকারে আলোর দিশা—কেরালা

সীমার নিচের কার্ড থাকা মানুষের জন্য অতিরিক্ত ৩৫ কেজি রেশন বিনামূল্যে দেওয়া হয় এক মাস। এপিএলসহ অন্যান্য কার্ড হোল্ডারদের জন্য বিনামূল্যে ১৫ কেজি চাল দেওয়া হয়। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সমৃদ্ধ প্রায় ৮৮ লক্ষ কিট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এপিল, বিপিএল নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে। এর জন্য বরাদ্দ হয় ৮৭৯ কোটি টাকা। সরকারের লক্ষ্য ছিল রাজ্যে বসবাসকারি একজন মানুষও যাতে অনাহারে মারা না যায়। জনগণের রান্নাঘর (কমিউনিটি কিচেন) তৈরি করা হলো বিভিন্ন জায়গায় অসুস্থ, প্রবীণ ও নিরন্ন মানুষকে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য। রাজ্যের ১০৩৪টি পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশন এলাকায় ১১৩৭টি জনগণের রান্নাঘর তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৮২ জনকে খাবার দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ১ লক্ষ ৭ হাজার ১২৮ জনকে বিনামূল্যে এবং বাকি আংশিকভাবে সমর্থ মানুষের থেকে মাথাপিছু সামান্য ২০ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল।

কোভিড সমস্যা মোকাবিলার পাশাপাশি সঙ্কট নেমে আসা প্রতিটি শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে কেরালা। কেরালায় বিভিন্ন রাজ্যের কয়েক লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন। লকডাউনের কারণে সঙ্কটকালীন সময়ে কেরালা সরকার ৩,৫২,৫১৫ জন অতিথি শ্রমিকের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। তার জন্য রাজ্যজুড়ে ১৯৯০২টি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর অতিথি শ্রমিকদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ পরিচিতি কার্ড প্রদান করে। রাজ্য সরকার পরিকল্পিতভাবে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে ফেরার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে।

রাজ্য সরকার কেরালার অধিবাসী যাঁরা ভিন দেশে অথবা ভিন রাজ্যে নানা কারণে থাকেন, তাঁদের ফেরানোরও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরকম প্রায় ৪ লক্ষ ভিন রাজ্যে থাকা কেরালাবাসী ফেরার জন্য নাম নথিভুক্ত করেন। ভিন দেশে থাকা প্রায় দেড় লক্ষ কেরালাবাসী নাম নথিভুক্ত করেন রাজ্যে ফেরার জন্য। এদের ফেরানোর ব্যাপারেও পরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করে কেরালা সরকার। এঁদের সকলের জন্য কোভিড-১৯ সুরক্ষা পদ্ধতি কঠোর ভাবে মান্য করা হয়। তাঁরা যেখান দিয়ে কেরালায় প্রবেশ করছেন, সেখানে তাঁদের পরীক্ষার ব্যবস্থার করা হয়। সংক্রামিতদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্যদের হোম কোয়ারেন্টাইনে অথবা সরকার নির্দিষ্ট কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া হয়।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উদ্যোগ কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার গ্রহণ করে। সেটা হলো বিপর্যয়ের জন্য অর্থনীতি ও জনকল্যাণের বিষয়গুলিকে রক্ষা করার জন্য আপৎকালীন, স্বল্পসময়কালীন ও দীর্ঘ সময়কালীন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা ৪ ঘণ্টার নোটিশে লকডাউনের ঘোষণা এবং অন্যান্য পদক্ষেপ আমস্মিকভাবে এবং সম্পূর্ণত স্তব্ধ করে দেয় পণ্য উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে। সমস্যাটা সীমান্তে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় ছিল না, এই সমস্যাটা ছিল সর্বব্যাপী এবং সুদূর প্রসারি। এটা তো শুধু রাজ্যের সমস্যা নয়, গোটা দেশই এই সমস্যায় জর্জরিত। এর সাথে যুক্ত হলো অন্য রাজ্য ও দেশ থেকে মানুষের কেরালায় ফিরে আসা। এদের একটা বড় অংশই কাজ হারিয়েছে। এই সমস্যাগুলি ভবিষ্যতে কেরালায় একটা গুরুতর ক্ষতিকর অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলবে।

কেরালা সরকার অর্থনৈতিক এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসার পরিকল্পনাও শুরু করেছে। এইরকম একটি পরিকল্পনার নাম হলো "সুভিক্ শা কেরালা"। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই কর্মসূচী। এরকমভাবেই শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে দাঁড় করাবার পরিকল্পনা কেরালা সরকার করছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কেরালার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রের প্রদেয় জিএসটির ক্ষতিপূরণের টাকা বরাবর বিলম্বে পৌঁছোয় রাজ্যে। রেগার বরাদ্দ, বন্যার ক্ষতিপূরণের টাকার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা।

এর সাথে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আচরণ হচ্ছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলির। এরা নানাভাবে সরকারকে বদনাম করতে বা অপপ্রচার করতে ব্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আরব দেশগুলিতে প্রচুর কেরালার মানুষ কর্মসূত্রে বসবাস করেন। তাদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ যখন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে, তখন রাজ্য সরকার সঙ্গত কারণেই কিছু কোভিড-বিধি পালনের কথা বলে। রাজ্য সরকার বলে যে সংক্রামিত নন এমন ব্যক্তিরা কেন্দ্রের নির্ধারিত বিমানে ফিরুক, কিন্তু সংক্রামিত ব্যক্তিরা অন্য বিমানে ফিরুক। রাজ্য সরকার এই প্রস্তাবও দেয় যে সমস্ত যাত্রীদের কোভিড সংক্রমণ পরীক্ষার শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করা হোক। রাজ্যবাসীর স্বার্থে এই পদক্ষেপ বৈষম্যের মানসিকতা পোষণকারী কেন্দ্র মানেনি। রাজ্যের কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলি এটাকে অপব্যাখ্যা করে প্রচার করে যে, আরবে বসবাসকারী কেরালার নাগরিকদের রাজ্য সরকার ফিরতে দিতে চায় না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সত্য ঘটনা জনগণের সামনে প্রকাশিত করা হলে জনগণ সত্যটা জানতে পারে। বর্তমানে কেরালায় আবার সংক্রামিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও কোথাও গোষ্ঠী সংক্রমণের কথা কেরালা সরকার নিজেই স্বীকার করেছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আরব দেশগুলি থেকে কেরালার মানুষদের ফেরার সময় রাজ্য সরকারের দাবিগুলিকে না মানাকেই দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কেরালার করোনা সংক্রমণরোধে এই সাফল্য অবশ্যই রাজ্য সরকারের প্রাপ্য। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপগুলি এই সাফল্যকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম, লাওসের মতো কেরালাও দেখিয়েছে যে করোনা বা যে কোনো অতিমারী সামাল দিতে সরকার নিয়ন্ত্রিত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাই অগ্রনী ভূমিকা নেয়। এছাড়াও প্রয়োজন শাসক দলগুলির এবং সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। কেরালার এই সাফল্যে সেখানার শাসক জোটের রাজনৈতিক দলগুলির ইতিবাচক ভূমিকা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের গঠনমূলক সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য। সেখানকার জনগণ ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্কও অনুঘটকের কাজ করেছে।

সর্বোপরি যেটা বলা প্রয়োজন একটি অঙ্গ রাজ্য অতিমারীকে পরাভূত করতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাই এখানে সর্বাগ্রে থাকা উচিত। এই দিকটা খুবই দুর্বল তাই কেরালায় করোনার বিরুদ্ধে লড়াই নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আবার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে। তবে কেরালাই গোটা দেশকে অতিমারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ দেখাচ্ছে, ভবিষ্যতেও দেখাবে—এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। □

মে দিবসের ইতিহাস—ফিরে দেখা

সুমিত ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস, বা ঐতিহাসিক মে দিবসের আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু ১৮৯০ সালে। ১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিবেশন থেকে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের সংগঠনগুলির কাছে প্রতি বছর ১ মে দিনটিতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে প্রতিপালনের আহ্বান জানানো হয়। উপলক্ষ ছিল, ঐ অধিবেশনের ঠিক তিন বছর আগে, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহটি জুড়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিকে সামনে রেখে শ্রমিক শ্রেণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐ কর্মসূচী প্রতিপালন করলেও, শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতায় ভীত হয়ে মালিক শ্রেণীর ভাড়াটে গুণ্ডা ও পুলিশ বাহিনী হে মার্কেটের শ্রমিকদের সমাবেশকে ভণ্ডুল করার জন্য হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে আনে। প্রাণ হারান ১১ জন শ্রমিক, আহত হন বহু শ্রমিক। ঐ আন্দোলনকে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন এমন চারজন শ্রমিক নেতার প্রহসনমূলক বিচারের মধ্য দিয়ে ফাঁসি হয়। হে মার্কেটেই শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত হলো শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পতাকা। তারপর থেকে 'রক্তপতাকাই দেশ-কাল নির্বিশেষে সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতীক।

যে মূল দাবিটিকে সামনে রেখে হে মার্কেটের শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন, তা হলো, দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি। অর্থাৎ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রম প্রদানের সময় মালিকদের ইচ্ছাধীন না রেখে, আইনানুগভাবে স্বীকৃত একটি সময় নির্দিষ্ট করা, যা শ্রমিকদের বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত পরিসরে জীবন উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়েই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি উত্থাপন করেছিল। কারণ হাড়ভাঙা খাটুনি আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার জন্য, প্রতি বছর কয়েক হাজার পুরুষ ও নারী শ্রমিক মারা যাচ্ছিল। অপুষ্টির শিকার হয়ে মারা যাচ্ছিল শিশুরাও। এক কথায় নারকীয় পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ ও জীবন যাপন করতে হতো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের। তবে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা যে শুধুমাত্র আমেরিকার শ্রমিকদেরই ছিল তা নয়। সাধারণভাবে শিল্প বিপ্লবের সুফল আত্মসাৎ করতে পেরেছিল যে সমস্ত দেশের মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল বা বাণিজ্যিক পুঁজি, সেই সমস্ত দেশেই অবর্ণনীয় শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল, শিল্প পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই গর্ভজাত শ্রমিক শ্রেণীকে। ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলসের 'কন্ডিশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড'—এই শোষণ ও নিপীড়নের প্রামাণ্য দলিল।

হে মার্কেটের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল 'অ্যানার্কিস্ট' বা নৈরাজ্যবাদীরা। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে পরিচালিত কোনো আন্দোলন এটা ছিল না। এই আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে যেমন ছিল সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক উদ্যোগ, তেমনই ছিল এক সুদীর্ঘ ইতিহাস, যার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা পত্তনের পর থেকেই। অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচিত সেই ইতিহাস সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। যদিও, কলকরখানা-কেন্দ্রীক উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিতভাবে প্রথম যে দাবিটিকে সামনে এনেছিল তা হলো মজুরি বৃদ্ধির দাবি। এমনকি এই দাবিকে সামনে রেখে ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই ধর্মঘটের সংবাদও পাওয়া যায়। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির দাবি এক নম্বরে থাকলেও, তারই সাথে ঐ সময় থেকেই শ্রম সময় কমানোর দাবিও উত্থাপিত হতে থাকে। শোষণের মাত্রা যত বৃদ্ধি পেতে থাকলো, এবং শোষণের প্রধান মাধ্যম ছিল শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় ধরে (সূর্যদয় থেকে সূর্যাস্ত) হাড়ভাঙা পরিশ্রম করানো, ততোই ক্লান্ত অবসন্ন শ্রমিকদের কাছে, শ্রম সময় কমানোর দাবি কেন্দ্রীয় দাবি হিসেবে উঠে এলো। ১৮০৬ সালে ধর্মঘটী সুতাকল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ষড়যন্ত্র মামলায় এই তথ্যও উঠে এলো যে, শ্রমিকদের এমনকি দিনে ১৯-২০ ঘণ্টাও কাজ করতে হতো। স্বভাবতই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমসময় কমানোর দাবিতে একাধিক ধর্মঘট হয়। প্রথমে উত্থাপিত হয়েছিল দিনে ১০ ঘণ্টা কাজের দাবি। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার 'মেকানিক্স্ ইউনিয়ন' ১০ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে একই দাবিতে ধর্মঘট করে নিউ ইয়র্কের পাঁউরুটি কারখানার শ্রমিকরা। ঐ ধর্মঘটের সমর্থনে 'ওয়ার্কিং মেনস অ্যাডভোকেট' নামে একটি সাময়িক পত্রিকায় লেখা হয়, "পাঁউরুটি কারখানার শ্রমিক, যাদের দৈনিক ১৮-২০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, তাদের অবস্থা আরব দেশের দাসেদের থেকেও খারাপ। কারণ তাদের দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮-২০ ঘণ্টাই কাজ করতে হয়।" খুব দ্রুত ১০ ঘণ্টা কাজের দাবি একটা আন্দোলনের চেহারা নেয় এবং ১৮৩৭ সালে আমেরিকায় শিল্প পুঁজি সঙ্কটে পড়া সত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি ভ্যান বুরেন সরকারী ক্ষেত্রে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের সময় ১০ ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে ডিক্রী জারি করেন। যদিও সবক্ষেত্রেই ১০ ঘণ্টা শ্রম সময় নির্দিষ্ট করার দাবিতে আন্দোলন চলতে থাকে, এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জিত হয়। ১৮৫৭ সালে শিল্প পুঁজি পুনরায় সঙ্কটের আবর্তে পড়ে। এবং সেই সঙ্কট থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য শোষণ প্রক্রিয়াও তীব্রতর হয়। দ্বান্দ্বিক নিয়মেই তীব্রতর শোষণের বিরুদ্ধে, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনও নতুন করে দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৫৭ পরবর্তী নতুন প্রেক্ষিতে ১০ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি সামনে চলে আসে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন যে শুধুমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই গড়ে উঠেছিল, তা নয়। যেখানেই পুঁজিবাদী শোষণ কায়েম হয়েছে, সেখানেই সমচরিত্রের আন্দোলন দানা বেঁধেছে। একই সময়অস্ট্রেলিয়ার নির্মাণ শিল্পের শ্রমিকরা সুনির্দিষ্টভাবে '৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিনোদন ও ৮ ঘণ্টা বিশ্রামের' দাবি উত্থাপন করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নবপর্যায়ের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি, যার সূত্র ধরেই 'মে দিবস'-এর আবির্ভাব, তা পরিচালিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে গড়ে ওঠা যৌথ আন্দোলনের নেতৃত্বে। ১৮৬১-৬২ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকেই, তৎকালীন বেশ কয়েকটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'দ্য মেশিনিস্ট্স্ এন্ড ব্ল্যাক স্মিথস্ ইউনিয়ন'। গৃহযুদ্ধের অবসানের পর আঞ্চলিক স্তরের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় ফেডারেশন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়। ১৮৬৬ সালের ২০ আগস্ট বাল্টিমোরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মিলিত হয় এবং ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়ন আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ এই সংগঠন গড়ে তোলার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই সময় আমেরিকায় জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা উইলিয়াম এইচ সিলভিস, সিলভিসের সাথে মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের যোগাযোগ ছিল। তাঁর মাধ্যমেই প্রথম আন্তর্জাতিকের সাথে ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়নের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৮৬৬ সালে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের প্রথম কনভেনশনে, যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো, "এই মুহূর্তে প্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, এ দেশের শ্রমিকদের পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, আমেরিকার সমস্ত প্রদেশে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিকে মান্যতা দিয়ে আইন প্রণয়ন। আমরা এই দাবিগুলি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, সমস্ত শক্তিকে সংহত করে লড়াই চালিয়ে যাব।"

ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়নের ধারাবাহিক লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে '৮ ঘণ্টা' লীগগুলি গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন প্রদেশের সরকার সরকারী কাজে ৮ ঘণ্টা শ্রম সময় মেনে নেয়। ১৮৬৮ সালে মার্কিন কংগ্রেসও অনুরূপ আইন প্রণয়ন করে। সিলভিসের সাথে প্রথম আন্তর্জাতিকের ধারাবাহিক যোগাযোগ ছিল এবং তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়ন প্রথম আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৬৯ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিল সভায় ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল সিলভিসের। কিন্তু তার আগেই তিনি প্রয়াত হন। প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিল তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সিলভিসের মতো দক্ষ নেতার মৃত্যুর পর ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়নের সাংগঠনিক তৎপরতা হ্রাস পায় এবং অবশেষে তা বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়ন ১৮৬৬ সালের আগস্ট মাসে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কার্ল মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থের (১৮৬৭) প্রথম খণ্ডে 'শ্রম সময়' সম্পর্কিত অধ্যায়ে আমেরিকার ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়নের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি ঐ দেশের নিগ্রো ও সাদা চামড়ার শ্রমিকদের বর্ধিত শ্রেণী ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন, "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যতদিন পর্যন্ত দাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল, ততদিন কোনো ধরনের স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কালো চামড়ার শ্রমিককে দাস বানিয়ে রেখে, সাদা চামড়ার শ্রমিকরা শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। কিন্তু দাস ব্যবস্থার অবসানের পরেই এক নতুন ধরনের জীবনবোধের উন্মেষ ঘটেছে। গৃহযুদ্ধের প্রথম ফল হলো, বিদ্যুৎগতিতে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, নিউ ইংল্যান্ড থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া।

মার্কস আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তা হলো, বাল্টিমোরে ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়নের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণের দু'সপ্তাহের মধ্যেই প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনিভা কংগ্রেস একই প্রস্তাব গ্রহণ করলো। তিনি বললেন, "পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অতলান্তিকের উভয় পারে শ্রমিক শ্রেণীর সমচরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া।" জেনিভা কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবে স্পস্টতই বলা হলো, উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে যে সাধারণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, এই কংগ্রেস সেই দাবিটিকেই সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ দাবি হিসেবে তুলে ধরছে।

অর্থাৎ শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ঘটনাই যে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা নয়। তারও বহু আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল, পথ দেখিয়েছিল।

১৮৮০-১৮৯০ সময়কালে আমেরিকায় শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ ঘটে। যদিও এরই মধ্যে ১৮৮৩-৮৫, সে দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তার অন্তর্নিহিত চরিত্র অনুযায়ী চক্রাকার সঙ্কটে পড়ে। কর্মহীনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। একই সাথে বৃদ্ধি পায়, শ্রম সময় হ্রাসের দাবিতে জঙ্গী আন্দোলন।

এই প্রেক্ষাপটেই আমেরিকার নবগঠিত শ্রমিক ফেডারেশন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা ফেডারেশনের বাইরে থাকা শ্রমিকদের কাছে এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন 'নাইটস অফ লেবার'-এর কাছে এই মর্মে আবেদন করে। তারা ঘোষণা করে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি অর্জন করা সম্ভব নয়। ১৮৮৫ সালে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের কনভেনশনে, পরের বছর (১৮৮৬) মে মাসের প্রথম দিনটিতে সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে শ্রমিকদের ওয়াক আউটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফেডারেশনের এই সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে অস্বাভাবিক গতিতে তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় সাত লক্ষ। যদিও নিচের তলার শ্রমিকদের মধ্যে যখন এই ধর্মঘটকে সফল করার উদ্যোগ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন থেরেজা পাওয়ডারলির মতো কিছু নেতা, এই আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধর্মঘট না করার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে পাল্টা মৃদু প্রচার শুরু করে। কিন্তু পাওডারলির মতো নেতাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং সংগঠিত অংশের পাশাপাশি, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরাও বিশেষত ছুতোর ও সিগার শ্রমিকরা ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে।

হে মার্কেটের ঘটনার আগেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১-৮৪ সালের মধ্যে গড়ে ৫০০টি করে ধর্মঘট হতো। ১৮৮৫ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭০০ এবং ১৮৮৬ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৭২। ১৮৮৫ সালে ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছিল, এমন সংস্থার সংখ্যা ছিল ১,৪৬৭। ১৮৮৬ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১,৫৬২। নেতৃত্বের একাংশ মালিকদের দালালি করা সত্ত্বেও, ৫ লক্ষ শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আহূত এই ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করে।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ মে ধর্মঘটের কেন্দ্র শিকাগো হলেও, নিউ ইয়র্ক, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন, সেন্টলুই, ডেট্রয়েট প্রভৃতি শহরেও ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। শিকাগো শহরের সর্বাত্মক ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য শাসকশ্রেণী হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে আনে। ৩ মে ম্যাক্‌করমিক রিপার ওয়ার্কসের শ্রমিকরা যখন ধর্মঘটের সমর্থনে শান্তিপূর্ণ সভা করছিল, তখন পুলিশের পক্ষ থেকে নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। ৬ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং বহু শ্রমিক আহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদেই হে মার্কেটে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ মে। শান্তিপূর্ণ সভা চলাকালীন কেউ বা কারা জমায়েতের মধ্যেই বোমা নিক্ষেপ করে এবং যাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধ। নিহত মোট ১১ জনের মধ্যে ৪ জন ছিল শ্রমিক এবং ৭ জন পুলিশ কর্মী। বিচারের প্রহসন করে যে চারজন শ্রমিক নেতার ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা হলেন পারসমস্, ফিশার, স্পাইস্ ও এঙ্গেল।

এঁদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। কারণ তাঁদের ফাঁসির এক বছরের মধ্যেই ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়। এমনকি ১৮৯০ সালের ১ মে দিনটিতে পুনরায় ধর্মঘটের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। যদিও স্যামুয়েল গোম্পারসহ তৎকালীন ফেডারেশনের সংশোধনবাদী নেতৃত্বের একাংশ দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বানকে সীমিত করে। শুধুমাত্র ছুতোরদের ধর্মঘটের ডাক দেন। অথচ এই গোম্পারই আবার আমেরিকার শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, তা আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার জন্য, প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসটিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্যারিসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা আমেরিকার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুনলেন তাদের লড়াইয়ের কথা। আমেরিকার শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্যারিস কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করলো, বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী নিজ নিজ দেশে শ্রম সময় কমানোর কেন্দ্রীয় দাবিসহ অন্যান্য দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। এবং যেহেতু ইতোমধ্যেই আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার ১৮৯০ সালের ১ মে এই ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচী করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই ঐ দিনটিতেই সারা বিশ্বে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হবে।

এই ভাবেই শুরু হলো ঐতিহাসিক মে দিবসের পথ চলা। যদিও আজ আমেরিকার খুব কম মানুষই জানে 'মে দিবসে'র অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল তাদেরই দেশে। তারা মনে করে এটি বোধহয় পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা কিউবার মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের কোনো বিষয়। এমনকি সরকারী ভাবেও সে দেশে ১ মে-র পরিবর্তে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবারকে 'শ্রম দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বর্তমান সময়ে মে দিবসের কেন্দ্রীয় দাবিগুলি পুনরায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। তবে সেই সময়ে যা ছিল, অধিকার অর্জনের লড়াই আজ তা অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াই। এই লড়াইয়েও প্রেরণা যোগায় হে মার্কেটের সংগ্রাম। □

ক্রমিক নং কো-অর্ডি/৪২/২০ তারিখ ৯/৭/২০২০

প্রতি
মাননীয়া
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

মহাশয়া,

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত অতিমারীর প্রাদুর্ভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত সকল কর্মীদের জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা বলয় তৈরিতে আপনার হস্তক্ষেপ চেয়ে আমরা একাধিকবার পত্র মারফৎ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও পরিস্থিতির কোনো কাঙ্খিত অগ্রগতি ঘটেনি। ফলস্বরূপ, শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীরাই নয়, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীসহ একাধিক আধিকারিক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। বর্তমানে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত কর্মচারী সহ একাধিক প্রশাসনিক ভবনের কর্মচারীরাও কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অনতিবিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

ইতিমধ্যে, সংক্রমণের প্রভাব উদ্বেগজনক ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকায় কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার কনটেনমেন্ট জোনে পুনরায় লকডাউন জারি করা হয়েছে। সেইসব এলাকায় গণপরিবহণ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় কর্মচারীদের পক্ষে লকডাউন নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে সরকারী দপ্তরে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হবেন। সেক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত ৭০ শতাংশ কর্মচারীদের দপ্তরে উপস্থিত কিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে তার বাস্তব সম্মত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বাড়ির থেকে দূরবর্তী স্থানে কর্মরত কর্মচারীদের বাড়ির নিকটবর্তী কর্মস্থলে যুক্ত করে প্রশাসনকে সচল রাখা যেতে পারে। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনকে সচল রাখতে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনার সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রাখতে চাই।

আশা করি, আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সব ধরনের প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানে আপনি আমাদের সাথে আলোচনা করবেন এবং আলোচনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন ও সময় ধার্য করে জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়,

বিজয় শংকর সিংহ

(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

ক্রমিক নং ঃ কো-অর্ডি/৪৬/২০ তারিখ ঃ ২০/৭/২০২০

প্রতি
মাননীয়
মুখ্যসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

মহাশয়,

আপনি জানেন যে, মারণ করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত অতিমারীর প্রাদুর্ভাব উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট জরুরি পরিষেবাগুলিতে সর্বতোভাবে যুক্ত থাকতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও আই সি এম আর-এর গাইডলাইন মেনে মারণ করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত সুরক্ষা বলয় তৈরির (পিপিই পোশাক, তিন লেয়ার মাস্ক, স্যানিটাইজার, থার্মাল স্ক্যানার সহ অন্যান্য বন্দোবস্ত) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য স্তরের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বচ্ছন্দ ভাবে যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত গণ পরিবহন চালু রাখার জন্য একাধিকবার আবেদন জানানো হয়েছে। ইতিপূর্বে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আপনার হস্তক্ষেপ চেয়ে ১০ দফা প্রস্তাবনাও পেশ করা হয়েছে (পত্র নং ঃ কো-অর্ডি/৩৭/২০ তারিখ ঃ ৩/৬/২০২০)। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও পরিস্থিতির কোনো কাঙ্খিত অগ্রগতি ঘটেনি।

আপনি এও অবহিত আছেন যে, ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কোভিড-১৯ অতিমারী পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। গোষ্ঠী সংক্রমণের মাধ্যমে দৈনিক সংক্রমণের হার ক্রমান্বয়ে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী কাজের সাথে যুক্ত আধিকারিক সহ একাধিক কর্মচারী করোনা সংক্রমিত হওয়ায় কর্মী মহলে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কুচবিহার জেলা থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের কাকদ্বীপ পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারী দপ্তরে দ্রুতলয়ে সংক্রমণের ঘটনায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু দপ্তর। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ায় পুনরায় ৫০ শতাংশ কর্মী দিয়ে কাজ করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে সারা রাজ্যে সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারের মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে বলবৎ আইনগুলো রূপায়নে বিদ্যমান / নতুন করে তৈরি প্রোটোকল বা গৃহীত পরিচালন ব্যবস্থা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কতগুলো জরুরি বিষয়ে পুনরায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ—

১। গত ১৮ মে, ২০২০ (Memo No. 177-CS/2020 dt. 18/5/20) আপনার নির্দেশিকায় সর্ব সাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত প্রোটোকল ব্যবহার যোগ্য এলাকা / অফিসগুলোতে (hygiene protocol) এর বন্দোবস্ত রাখতে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে (স্যানিটাইজেশন, মাস্ক ব্যবহার ইত্যাদি) তাও সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি। অবিলম্বে তা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোভিড মোকাবিলার নিযুক্ত কর্মীদের এবং আক্রান্ত প্রতিটি সরকারী দপ্তরের কর্মচারীদের অনতিবিলম্বে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩। কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, দমকলকর্মী সহ অন্যান্য কর্মচারীদের যুক্ত করা হয়েছে (ইতিমধ্যে অনেকে প্রয়াত হয়েছেন) তাদের সরকার নির্দিষ্ট বীমার আওতায় আনা হচ্ছে না। বিষয়টি উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে সঠিক গাইডলাইন প্রকাশ করা প্রয়োজন।

৪। কোভিড-১৯ সংক্রমিত সরকারী কর্মচারীদের ওঃ বেঃ হেল্‌থ স্কিম, ২০১৪ এর আওতায় আনা এবং তদনুযায়ী প্রোটোকল মাফিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করে সরকারী নির্দেশিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

আমরা মনে করি সম্মিলিত এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়,

বিজয় শংকর সিংহ

(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিক্ষির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।